GIFT

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের সাথে বাঙালী জনগোষ্ঠীর সংহতি প্রতিষ্ঠার সংকট: একটি বিশ্লেষণ

মাসুমা সুলতানা
এম. ফিল গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৩১০
শিক্ষাবর্ষ: ২০০৩-২০০৪
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
ড. খন্দকার নাদিরা পারভীন
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
449998

449998

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য এই অভিসন্দর্ভ দাখিল করা হলো)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১০ মার্চ, ২০১১

449998

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মাসুমা সুলতানা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত ***"পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের সাথে বাঙালী জনগোষ্ঠীর সংহতি প্রতিষ্ঠার সংকট: একটি বিশ্লেষণ"*** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। আমার জানামতে, এই শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেনি। এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এ অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

(ড. খন্দকার নাদিরা পারভীন)

১০/৬/২০১১ ই.

তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

449998

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করা যাচ্ছে যে,আমি মাসুমা সুলতানা এম. ফিল গবেষক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত ***" পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের সাথে বাঙালী জনগোষ্ঠীর সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার সংকট: একটি বিশ্লেষণ "*** শীর্ষক আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ড. খন্দকার নাদিরা পারভীন, অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। অভিসন্দর্ভটি এই শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেনি। এই অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশ বিশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে এম. ফিল ডিগ্রী অথবা পি. এইচ. ডি ডিগ্রী কিংবা সমমানের কোনো ডিগ্রীর জন্য কখনো প্রকাশিত হয়নি।

(মাসুমা সুলতানা)

মাসুমা সুলতানা
১০. ০৩. ২০১১

449998

রেজিস্ট্রেশন নং- ৩১০ (২০০৩-২০০৪)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

গবেষকের কথা

গবেষণা কর্মটি সফলতার সাথে শেষ করতে পেরে আমি ব্যক্তিগতভাবে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছি। গবেষণা কর্মের প্রক্রিয়ায় একজন গবেষক যখন কাজ করেন তখন প্রধান গবেষকের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন আরও অনেক ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান। শুধুমাত্র গবেষকই সেইসব ব্যক্তিবর্গের অবদান উপলব্ধি / অনুধাবন করতে পারেন। অনেকের সহযোগিতায় কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করা সহজ হয়েছে। তারপরেও যাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ তাঁদের কয়েকজনের অবদানের কথা উল্লেখ করতে চাই। প্রথমেই আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ড. খন্দকার নাদিরা পারভীন এর প্রতি। গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি আমার সব সমস্যা ও প্রতিকূলতা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি আমার পাশে ছিলেন। প্রতিটি বিষয় তিনি আমাকে খুবই আন্তরিকতার সাথে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতো একজন উদারমনা মানসিকতার অধিকারী মানুষের তত্ত্বাবধানে কাজ করতে পেরে আমি সত্যিই খুব গর্বিত।

আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের পরেই আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক গোবিন্দ চক্রবর্তীর প্রতি, সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এই গবেষণার কাজে আমি তাঁর কাছ থেকে সব রকমের সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছি। শুধু তাই নয়, তাঁর সহযোগিতা ছাড়া হয়তো আমি এম.ফিল এ ভর্তিই হতে পারতামনা। তাঁর উৎসাহেই আমি আমর কাজের গতি বৃদ্ধি করতে পেরেছি।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার কয়েকজন বন্ধুর প্রতি যারা আমাকে এই গবেষণা কাজে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছে, তারা হলো জলি সাংমা, শাহিনুর নার্গিস, সাগর এবং সুবিন । জলি সাংমা বান্দরবান রাজ পরিবারের একজন সদস্য। আমি যতবার বান্দরবানে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়েছি নার্গিস আমার সাথে ছিল এবং জলি সেখানে সার্বিকভাবে আমাকে সহযোগীতা করেছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার বন্ধু সাগরের প্রতি, আমার গবেষণা কর্মের, বেশিরভাগ ছবিই যার তোলা। সে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে এই ছবিগুলো তুলেছে। সুবিন আমার এই গবেষণার পুরো এডিটিং এর কাজটি করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বোপরি আমার সকল শুভানুধ্যায়ী যারাই গবেষণার কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বিনীত

মাসুমা সুলতানা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

ফোন : ৯৬৬১৯০০-৭৩/৬৪৯০
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৩
E-mail : duregstr@bangla.net

তারিখ : ৭/১২/২০১০

সাক্ষাৎকার গ্রহনের জন্য অনুমতিপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মাসুমা সুলতানা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এম.ফিল গবেষণারত। তার গবেষণার বিষয়বস্তু ***" পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের সাথে বাঙালী জনগোষ্ঠীর সংহতি প্রতিষ্ঠায় সংকট: একটি বিশ্লেষণ "*** । তার গবেষণার অংশ হিসেবে সাক্ষাৎকার গ্রহন প্রয়োজন। এজন্য আপনার/ আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, আপনাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত সকল তথ্য কেবলমাত্র গবেষণার কাজেই ব্যবহার করা হবে।

(ড. খন্দকার নাদিরা পারভীন)

তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

বাবা ও মা কে

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের সাথে বাঙালী জনগোষ্ঠীর সংহতি প্রতিষ্ঠার সংকট: একটি বিশ্লেষণ

গবেষণার সারসংক্ষেপ

বিশ্বের সর্বত্রই আদিবাসী সম্প্রদায় হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে যেটা তাদেরকে রিফিউজি অথবা অভ্যন্তরীন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিণত করছে। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। ২০০ বছর বৃটিশ শাসন ও ২৫ বছর পাকিস্তানী শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ৯ মাস মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে '৭১ সালে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম লাভ করে। কিন্তু যে আশা আকাঙ্খা নিয়ে এদেশের মানুষ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গড়ে তোলে তার বাস্তব প্রতিফলন অনেকাংশেই অপূর্ণ থেকে গেছে।

স্বাধীনতার পর থেকেই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, স্বল্প মাথাপিছু আয়, অশিক্ষা, ধর্মীয় ও গোষ্ঠীগত বৈষম্য এদেশের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল । যদিও স্বাধীনতা পরবর্তী অবস্থা হতে বর্তমান অবস্থা অনেক উন্নত । আদিবাসীদের প্রতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নি সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের যেমন ইতিবাচক দিক রয়েছে তেমনি রয়েছে নেতিবাচক দিক ।

স্বাধীনতার পর পরই দেশগঠন প্রক্রিয়া ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে চললেও আনুপাতিক হারে জাতি গঠনের দিকে সুদৃষ্টি দেওয়া হয়নি । ফলে দেশের একপ্রান্তে বসবাসকারী নৃতাত্ত্বিক , ভাষাগত , সংস্কৃতিগত এবং বর্ণগত দিক দিয়ে মূল জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আদিবাসীদের মধ্যে জাতীয় বীজ বোপন করা সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন সরকারের আমলে যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয়েছে তা দেশের জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় তেমন কোন সুফল বয়ে আনতে পারেনি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সাথে বাঙালী জনগণের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে কীভাবে জাতিগঠনের প্রক্রিয়াটিকে আরো অগ্রসর করে নেওয়া যায় তারই লক্ষ্যে এই গবেষণাটি করা।

Dhaka University Institutional Repository

"পার্বত্যচট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের সাথে বাঙালী জনগোষ্ঠীর সংহতি প্রতিষ্ঠার সংকট: একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক গবেষণা কর্মটি ছিল একটি সময়ের দাবি। গবেষণার উপরোক্ত উদ্দেশ্য অর্জনে অভিসন্দর্ভটি মোট সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। গবেষণা কার্যক্রমটি মূলত, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ।।

প্রথম অধ্যায়: এই অধ্যায়ের ভূমিকা শিরোনামে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে যথা গবেষণার পরিধি, গবেষণার তাৎপর্য, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার যৌক্তিকতা, গবেষণার পদ্ধতি, গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: দ্বিতীয় অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-প্রকৃতি শিরোনামে ভৌগলিক অবস্থান (সীমানা, আয়তন, পাহাড়, নদ-নদী, হ্রদ, জলবায়ু), প্রশাসনিক ইউনিট এবং উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর বিবরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। আদিবাসী কারা, আদিবাসী সংজ্ঞা, বাঙালী জাতির আদি পরিচিতি, আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাসস্থল, আদিবাসী সম্প্রদায়ের পরিচিতি, আদিবাসীদের বাংলাদেশে আসার ইতিহাস এই বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। জাতি হিসেবে বাঙালীর উদ্ভবের ইতিহাস তুলে ধরার পাশাপাশি আমি চেষ্টা করেছি আদিবাসীদেরও।

চতুর্থ অধ্যায়: চতুর্থ অধ্যায়ে জাতীয় সংহতি শিরোনামে জাতীয় সংহতির সংজ্ঞা, বাংলাদেশে কি জাতীয় সংহতি আছে? বাংলাদেশে জাতীয় সংহতি না থাকার কারণ এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
পঞ্চম অধ্যায়: এই অধ্যায়ে যেসব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে সেগুলো হলো বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা কি জাতি গঠন সমস্যা?, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিচ্ছিন্ন কোনো অঞ্চল নয়, বিভিন্ন শাসনামলে আদিবাসীদের অবস্থান।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়: পাহাড়ে শান্তি প্রক্রিয়া শিরোনামে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন: প্রথমেই ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করতে হবে এবং এজন্য ভূমি কমিশন গঠন করে তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার নিশ্চয়তা দিতে হবে। নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অধিকার দিতে হবে। এরপরে আলোচনা করা হয়েছে জাতিসংঘ যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে তা নিয়ে। আদিবাসীদের দাবি সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়টি, ও সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারের বিষয়টি এখানে আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে আলোচনা করা হয়েছে বাংলাদেশ সরকার শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে চুক্তি করেছে অর্থাৎ পার্বত্য শান্তি চুক্তি নিয়ে।

সপ্তম অধ্যায়: এই অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে মাঠ পর্যায়ে কাজ করার পর যে বিষয়টি উঠে এসেছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং আমি আমার নিজস্ব মত তুলে ধরেছি।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়:	ভূমিকা	১-১১
	১.১ গবেষণার পরিধি	৪
	১.২ গবেষণার বিষয়বস্তু, গুরুত্ব ও তাৎপর্য	৪
	১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য	৫-৮
	১.৪ গবেষণার পদ্ধতি	৯
	১.৫ গবেষণার যৌক্তিকতা	৯-১০
	১.৬ গবেষনার সীমাবদ্ধতা	১০
	১.৭ তথ্য নির্দেশিকা	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়:	পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-প্রকৃতি	১২-২২
	২.১ অবস্থান, সীমানা, ভূ-প্রকৃতি, আয়তন, পাহাড়শ্রেণী, নদ-নদী, হ্রদ, জলবায়ু ১৮-২০	
	২.২ প্রশাসনিক ইউনিট	২০-২১
	২.৩ উদ্ভিদ ও প্রাণী	
	২.৪ তথ্য নির্দেশীকা	২২
তৃতীয় অধ্যায়:	পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর বিবরণ	২৩-৪২
	৩.১ আদিবাসী কারা	২৭-২৯
	৩.২ আদিবাসী সংজ্ঞা	২৯-৩১
	৩.৩ বাঙালী জাতির আদি পরিচয়	৩১-৩৮
	৩.৪ আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাসস্থল	৩৮
	৩.৫ আদিবাসী সম্প্রদায়ের পরিচিতি	৩৮৪১
	৩.৬ আদিবাসীদের বাংলাদেশে আসার ইতিহাস	৪১

Dhaka University Institutional Repository

	৩.৭ তথ্য নির্দেশীকা		৪২
চতুর্থ অধ্যায়:	জাতীয় সংহতি	৪৩-৬৬	
	৪.১ জাতীয় সংহতির সংজ্ঞা		৪৫-৪৬
	৪.২ বাংলাদেশে কি জাতীয় সংহতি আছে?		৪৬-৪৭
	৪.৩ বাংলাদেশে জাতীয় সংহতি না থাকার কারণ		৪৭-৪৯
	৪.৪ তথ্য নির্দেশীকা		৫০
পঞ্চম অধ্যায়:	৫.১ বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা কি জাতি গঠন সমস্যা?		৫১-৫৪
	৫.২ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিচ্ছিন্ন কোনো অঞ্চল নয়		৫৪-৫৭
	৫.৩ বিভিন্ন শাসনামলে আদিবাসীদের অবস্থান		৫৭-৬৫
	৫.৪ তথ্য নির্দেশীকা		৬৬
ষষ্ঠ অধ্যায়:	পাহাড়ে শান্তি প্রক্রিয়া	৬৭-১৩১	
	৬.১ কেন এই সংঘাত		৬৯-৭৫
	৬.২ প্রথমেই ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি করতে হবে		৭৫-৮০
	৬.৩ ভূমি কমিশন গঠন		৮০-৮১
	৬.৪ নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অধিকার		৮১
	৬.৫ শরণার্থী পূর্ণবাসন		৮২-৮৫
	৬.৬ জাতিসংঘ গৃহীত পদক্ষেপ		৮৫-৮৬
	৬.৭ সাংবিধানিক স্বীকৃতির প্রয়োজন		৮৭-৮৮
	৬.৮ সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার		৮৮-৯৪
	৬.৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি		৯৪-৯৫
	৬.১০ ১৯৭১ থেকে ১৯৯৭: বিভিন্ন সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ		৯৫-১১২
	৬.১১ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ		১১৩
	৬.১২ ১৯৯০ থেকে ১৯৯৭: সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ		১১৪-১১৭
	৬.১৩ চুক্তির সফলতা ও বিফলতা		১১৮
	৬.১৪ পূর্ণ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে		১১৮-১২০

Dhaka University Institutional Repository

	৬.১৫ যা বাস্তবায়িত হয়েছে	১২০-১২১
	৬.১৬ গুরুত্বপূর্ণ যা ঝুলে আছে	১২১-১৩০
	৬.৭ তথ্য নির্দেশীকা	১৩১
	নমুনা প্রশ্ন	১৩২-১৩৩
সপ্তম অধ্যায়:	উপসংহার	১৩৪-১৩৭
	উপসংহার ও অভিমত	

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা:

সুজলা সফলা শস্য শ্যামলা আমাদের এই দেশ বাংলাদেশ। এখানে বেশিরভাগ মানুষ বাংলায় কথা বলে,বাঙালী। অর্থাৎ এখানকার মাতৃভাষা বাংলা এবং বাঙালীরা সংখ্যাগোরীষ্ঠ। তথাপি ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ছোট্ট এই দেশটিতে আমরা নানা বর্ণ, গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করছি । বাঙালী জাতীয়তাবোধের উর্দ্ধে আমাদের একটি বড় পরিচয় আমরা বাংলাদেশের নাগরিক, আমরা বাংলাদেশী । পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বের একটি অংশ । এখানে প্রায় এগার রকমের আদিবাসীর বাস। ম্যোম, চাক, চাকমা, খীয়াং, খুমী, লুসাই, মারমা, ম্রো, পাংখো, তঞ্চগ্যা, এবং ত্রিপুরা, বাস করেন । মূলত তারা জুম্ম নামে পরিচিত । প্রায় ৭০,০০০ জুম্ম এখানে বাস করে থাকেন । সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীর থেকে তাদের সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভাষা এবং ভূমিস্বত্ত্বা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

উপনিবেশিক আমলের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা নিজেরাই তাদের আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার বজায় রাখতো । মুঘোল আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম করদ রাজ্য হিসেবে ছিল এবং মুঘোলরা কখনোই তাদের প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করেনি । এরপর পার্বত্য চট্টগ্রাম বৃটিশ উপনিবেশের নিয়ন্ত্রনে চলে যায় । সেই সময় "পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০" নামে বৃটিশরা আইন পাশ করে যার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম 'এক্সক্লুডেড এরিয়া' হিসেবে গণ্য হয় । এটা জুম্ম জনগণের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে যার মাধ্যমে বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ এবং বসবাসকে নিয়ন্ত্রন করা হয় । ১৯৪৭ সালে যখন ভারত উপমহাদেশ ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয় তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অংশে পরে এবং তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলীম ছিল মাত্র ২.৫% ।

প্রথম থেকেই পাকিস্তানী সরকার তার শাসন আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলীমদের এলাকা হিসেবে গড়ে তুলতে শুরু করে । এই নীতি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভঙ্গ করে পাকিস্তানী সরকার হাজার হাজার অ-আদিবাসীদের সমতলের জেলাগুলো থেকে সরিয়ে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করাতে শুরু করে । ষাটের দশকের প্রথমদিকে পাকিস্তানী সরকার " এক্সক্লুডেড এরিয়া " হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাদ দিয়ে একে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে । বহিরাগত লোকদের বসতিস্থাপন সহজ করার জন্য সরকার একতরফাভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম আইনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অংশ সংশোধন করে । পাকিস্তানী সরকার ১৯৬২ সালে শিল্পায়নের নামে ও উন্নয়নের নামে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপন করে । যার ফলে প্রায় চুয়ান্ন হাজার একর (৪০ %) চাষযোগ্য জমি পানিতে তলিয়ে যায়, এক লক্ষের বেশি জুম্ম ঘর ছাড়া হয় । পাকিস্তানী সরকারেরও আন্তরিকতার অভাবে এই গৃহহীন জুম্মদের সঠিকভাবে পূনর্বাসন করা সম্ভব হয়নি । যার ফলে চল্লিশ হাজার মানুষ ভারতে চলে যায় ।

১৯৭১ সালে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশর অভ্যুদয় ঘটে । আদিবাসী জুম্মরা আশা করেছিল যে , বাংলাদেশের নূতন শাসকেরা পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার ও দমনের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম তারা করেছিলেন , একইভাবে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের সেই আশা বুঝতে পারবেন এবং জুম্মরা সকল প্রকার অত্যাচার ও বৈষম্য থেকে মুক্ত হবে । যার ফলে জুম্মরা তৎকালীন সরকারের কাছে গণতান্ত্রিক উপায়ে তাদের দাবি করেছিলেন । দূভার্গ্যবশত তৎকালীন সরকার জুম্মদের মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান দেখায়নি এবং আদিবাসী জুম্ম জনগনের পরিচয় ও অধিকারের ব্যাপারে সংবিধানে উল্লেখ করেনি । অপর দিকে বাংলাদেশের নূতন সরকার জুম্ম জনগণকে সংখ্যাগোরিষ্ঠ্য বাঙালী জনগনের সাথে মিশে যাওয়ার উপদেশ দেয় । আদিবাসী জুম্ম জনগন সরকারের কাছে তাদের দাবি বার বার তুলে ধরেছিলেন কিন্তু কখনো সরকার সেদিকে দৃষ্টি দেয়নি[১] ।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে মিলিটারি বাহিনী পাঠানো হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের দমন করার জন্য । যেটা তাদেরকে বিদ্রোহী করে তোলে । কেননা তারা তাদের চাহিদা তেকে বঞ্চিত হয়েছিল । এরফলে আদিবাসী সম্প্রদায় অবস্থানচ্যুত হয়ে পরে এবং পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে । আদিবাসীরা ১৯৮১, ১৯৮৪ , ১৯৮৯ , ১৯৯২ সালে উদ্বাস্তু হিসেবে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে [২]। কিন্তু ভারত সরকার কখনই তাদের ভালোভাবে গ্রহণ করেনি । মাঝে মাঝেই ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদের ফুল ব্যাক করাতো । আবার উদ্বাস্তুদের মধ্যে যারা ভারতে আশ্রয় পেয়েছিল তাদের অনেকেই আর বাংলাদেশে ফিরে আসতে চায়নি নিরাপত্তার কারণে [৩]। কিন্তু ভারত সরকার তাদের উদ্বাস্তু হিসেবে কোন মূল্য দেয়নি । বরং অনুরোধ করেছে তাদের বাংলাদেশে ফিরে আসতে । ভারতীয় শিবিরে বাংলাদেশী উদ্বাস্তুরা খুব নিম্নমানের জীবন যাপন করতো । তথাপী ভারত সরকার UNHCR বা অন্য কোন NGO দের সাহায্য দেবার জন্য অনুমোদন দেয়নি । এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে চুক্তিপূর্ব আলোচনার সময় কোন সরকারই চায়নি UNHCR কে যুক্ত করতে । যদিও উদ্বাস্তুদের দাবি ছিল এই আন্তর্জাতিক সংগঠনটিকে সম্পৃক্ত করা ।

Dhaka University Institutional Repository

যখন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সব পথ বন্ধ হয়ে যায় , জুম্ম জনগণ তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে তাদের দাবি নিয়ে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে । তখন অনেক সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীকে ঐ এলাকায় পাঠানো হয় । সশস্ত্র সংগ্রামের সময় বাংলাদেশের সরকার জুম্ম জনগণের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের একই নীতি অনুস্মরণ করে । কম করে হলেও চার লক্ষ বাঙালী মুসলমানদের পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত করা হয় । ১৯৭৯ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার পাহাড়ী এলাকায় পাহাড়ীদের চেয়ে বাঙালীদের সংখ্যা ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য বাঙালীদের আইনগত ভাবে সেখানে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেন । সরকার ঘোষণা দেন যে , যেসব বাঙালী (সেটলার) সেখানে যাবে তাদেরকে সাত একর জমি ও রেশন অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেওয়া হবে । প্রকৃতপক্ষে সেখানে চাষযোগ্য কোন জমি ছিলনা । যার কারণে সেটলাররা জোর করে আদিবাসীদের ভূমি দখল করতে শুরু করে । সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে সেটলারদের দ্বারা এখানে দীর্ঘ সময় ধরে নির্মমভাবে এবং সমূলে গণহত্যা সংঘটিত হয় । হাজারো আদিবাসী তাদের বাড়ি ঘরের স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত হয় । তাদের মধ্যে প্রায় সত্তর হাজার জুম্ম জনগণ শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে । সেখানে তারা নিজেদের নিরাপদ মনে করেছিল । ফলে হাজার হাজার আদিবাসী তাদের মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হয় ।

কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংহতি সমিতি সবসময়ই রাজনৈতিক এবং শান্তিপূর্ণভাবে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের পথ খোলা রেখেছিল । এই উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি খালেদা জিয়া ও এরশাদ সরকারের সাথে উনিশবার আলোচনায় বসেছিল । শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে সাত বার আলোচনার পর "পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি " নামে একটি চুক্তি ১৯৯৭ সালের ২ নভেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে সম্পাদিত হয় ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির মাধ্যমে জুম্ম জনগণ ও সরকারের মধ্যকার দীর্ঘ দুই দশকের অধিককালের প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব ও সশস্ত্র সংঘাতের অবসান হয়েছিল । এই চুক্তি কেবল বাংলাদেশের সকল মানুষের কাছেই নয় , বরং জাতিসংঘ , ইউরোপিয় ইউনিয়ন , বিশ্বে অনেক গণতান্ত্রিক সরকার , আন্তর্জাতিক সংগঠন , সংস্থা, ব্যক্তিত্ব দ্বারা অভিনন্দিত ও স্বীকৃত হয়েছিল [৪] ।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু এই চুক্তি এখনো বাস্তবায়িত হয়নি । চুক্তি বাস্তবায়িত না হবার কারণ গুলোর অন্যতম হলো বিগত সরকার গুলোর রাষ্ট্রীয় নীতি । পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের নীতি ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে মুসলীম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা । সরকার সেটলারদের বসতি স্থাপনের মাধ্যমে এবং বাঙালী মুসলমানদের ভোটার তালিকায় সংযুক্ত করে এই নীতি বাস্তবায়িত করেছে । শুধু চুক্তিই স্বাক্ষরিত করেছে সরকার কিন্তু সরকারী নীতিতে আনেনি কোন পরিবর্তন ।

চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি আরো অশান্ত হয়ে উঠেছে । এটা আরো জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে । অনেকেরই ধারণা পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোড় নিতে পারে । এটা বলার অপেক্ষাই রাখেনা যে, সেটা বাংলাদেশের বৃহত্তম স্বার্থে এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জন্য ক্ষতিকর হবে ।

১.১ গবেষণার পরিধিঃ

গবেষণা কার্যক্রমটি মূলত, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই স্বার্থ সংরক্ষণ প্রক্রিয়াটিকে প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথম অংশে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক পরিচিতি। এ পর্যায়ে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান, সীমানা, ভূ-প্রকৃতি, আয়তন, নদ-নদী, প্রশাসনিক ইউনিট, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর বিবরণ। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর বিবরণ, আদিবাসী ও বাঙালীর পরিচয়। তৃতীয় অংশে রয়েছে জাতীয় সংহতি ও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রক্রিয়া।

১.২ গবেষণার বিষয়বস্তু, গুরুত্ব ও তাৎপর্যঃ

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার, জনসংহতি সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীগুলোর এবং বাঙালী, যারা ঐ অঞ্চলে বসবাস করছেন তাদের ভূমিকা পর্যালোচনা করলে প্রস্তাবিত

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণাটির তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী বাঙালী নির্বিশেষে সকলের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাচ্ছেন। তারমধ্যে শান্তি চুক্তি অন্যতম। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহনের পর পুনরায় শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশ ও জাতির বৃহত্তম স্বার্থে এ বিষয়ে সঠিক গবেষণার মাধ্যমে একটি পরিপূর্ণ চিত্র সকলের সামনে তুলে ধরা উচিত যাতে জনগণ, সরকার, এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসী বাঙালী সকলেই নিজ নিজ অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে ভুলত্রুটি গুলো পরিহার করে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

সুদূর অতীত থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্ত অবস্থা বিরাজ করে আসছে । ৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর পরই জন্ম লাভ করে জনসংহতি সমিতি ,শান্তিবাহিনীসহ অনেক রাজনৈতিক অরাজনৈতিক দল , উদ্দেশ্য পার্বত্যবাসীদের (আদিবাসী) স্বার্থরক্ষা । এইসব রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক দল নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করলে দেখা দেয় অশান্ত অবস্থা । ফলে শান্তির লক্ষ্যে রাজনৈতিক সমাধানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারের সাথে দীর্ঘ ৭ বছর আলোচনার পর ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা পার্বত্য শান্তি চুক্তি নামে পরিচিত।

শান্তিচুক্তির বারো বছর পার হয়ে গেলেও এর সঠিক প্রক্রিয়াকরণ এখনো শুরু হয়নি । এই পরিস্থিতিতে শান্তিবাহিনীর নেতা সন্তু লারমা সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে , এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে তারা আরো বিদ্রোহী হয়ে উঠবে । পাহাড়ী জনগোষ্ঠীরা বর্তমানে দুইভাগে বিভক্ত । একদল শান্তি বাহিনীর পক্ষে অন্যদল শান্তিবাহিনীর বিপক্ষে । তাদের যুক্তি হলো শান্তিবাহিনী নিজেদের স্বার্থে শান্তিচুক্তি করেছে । সামগ্রীকভাবে শান্তিবাহিনী পাহাড়ী জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরণে ব্যর্থ ।

এমতাবস্থায় তাদের পক্ষে বিদ্রোহ করাটা অসম্ভব কিছুনা । আর রিফিউজিরা বিদ্রোহী হয়ে উঠলে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটবে । দুই দেশই একে অপরকে দোষারোপ করছে

Dhaka University Institutional Repository

তাদের দেশের বিদ্রোহীদের সাহায্য করার জন্য । ভারত সন্দেহ করছে যে, বাংলাদেশী বিদ্রোহী দলের ১৯৫ টি ক্যাম্প রয়েছে [৫]। যেখানে তাদের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করা হচ্ছে । অপরদিকে বাংলাদেশও শান্তিবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য ভারতকে দোষারোপ করছে । পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর এই বিদ্রোহ অথবা রিফিউজিদের outflow বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে । এই এলাকার মধ্যে ভারত নেতৃত্ব দান করার চেষ্টা করছে ।

এককথায় ছোট্ট আয়তনের এই দেশটির এক অংশে যদি সর্বদাই অস্থিরতা বিরাজ করে তাহলে সেটা দেশের সার্বিক উন্নয়নের পথে বাধা। বাংলাদেশের একটি সম্পদসমৃদ্ধ এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রাম। সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মনমুগ্ধকর। প্রতিবছর বহু দেশী বিদেশী পর্যটক সেখানে বেড়াতে যায়। বৈদেশীক পর্যটকদের আগমন যত বেশি হবে দেশের পর্যটন খাতে আয় তত বাড়বে। কিন্তু সেখানে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পর্যাপ্ত পর্যটক আগমন হচ্ছেনা। আবার সরকারী বা বেসরকারী কোনভাবেই পর্যটন খাতে তেমন বিনিয়োগও হচ্ছেনা। সরকার পার্বত্য এলাকাটিকে যদি পর্যটন এলাকা হিসেবে গড়ে তুলে, সেখানকার জনগণসহ সকল দর্শনার্থীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে তাহলে সেটা দেশের জন্য মঙ্গলজনক। অপরদিকে পার্বত্যচট্টগ্রামে বসবাসরত আদিবাসীদেরও বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে যে, তারা আসলে কি চায়? শুধু সংকীর্ণ অর্থে নিজেদের ভালো চায়, না কি সার্বিকভাবে দেশের ভালো চায়?

আমি কয়েকটি প্রধান প্রধান ইস্যুর উপর আলোকপাত করবো যেগুলোর প্রতি আদিবাসী বাঙালী উভয় সম্প্রদায়ের অবস্থান থেকে বিশেষভাবে নজর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং যে কারণে এই গবেষণাটি করা ।

১। বিচ্ছিন্ন জাতীয়তাবোধঃ

যেকোন একটি দেশের স্বাধীনতার পেছনে জাতীয়তাবোধ একটি প্রধান নিয়ামক । জাতীয়তাবোধের কারণেই একটি দেশে বসবাসরত জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল নাগরিকের মধ্যে জাতীয় সংহতি বজায় থাকে । আবার এই জাতীয়তাবোধই পৃথিবীতে হাজারো সংঘর্ষের মূল কারণও বটে ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশেরও স্বাধীনতার লড়াইয়ে জাতীয়তাবোধ শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে আবার এই জাতয়ীতাবোধের কারণেই আদিবাসী সম্প্রদায় হুমকীর সম্মুক্ষীন । কাজেই আমাদের দেশের স্বার্থে বিচ্ছিন্ন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ না হয়ে সকলে মিলেমিশে একত্রে চলার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

২। সরকারী নীতিমালা :

বাংলাদেশী জনগণের সাথে পাহাড়ী জনগণের একত্রীকরণ প্রক্রিয়াটি এই প্রতিবেদনের আলোচ্য বিষয় । পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে বহুবার বল প্রয়োগের দ্বারা স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করা হয়েছে যদিও তারা বাঙালী জনগোষ্ঠীর সাথে একত্রে বসবাস করে আসছে তথাপী তাদেরকে একত্রীকরণের ক্ষেত্রে বহু সমস্যা আছে । এই অবস্থায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে নারী ও শিশুরা । এই অবস্থা শুধু পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর উপরেই নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে তা না , প্রতিবেশী দেশের সাথে সুসম্পর্কের ক্ষেত্রেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে ।

অনেক সময় ব্যাপক স্থানান্তরনের কারণে অথবা বিভিন্ন আধিপত্যের মাধ্যমে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভূমি কেড়ে নেওয়া হয়। এর ফলে তারা ভূমিহীন হয়ে পড়ে । ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে এইসব নীতিমালার প্রমাণ পাওয়া যায় । সরকারকেও এই বিষয়টি ভাবতে হবে যে তারাও বর্তমানে বাংলাদেশের নাগরিক। দেশের নাগরিক হিসেবে তাদেরও অধিকার আছে বাঙালীদেও মতো রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা পাওয়ার। কাজেই সরকার যে নীতিমালাগুলো গ্রহণ করবে সেগুলো যাতে এমন না হয় যে তাতে আদিবাসীরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সরকার অতীতে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলোও পরিবর্তন বা সংশোধন করা দরকার।

১। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ইস্যু (demografi):

আদিবাসী সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা কম বিধায় তাদের অস্তিত্ব হুমকীর সম্মখীন হয়েছে । অন্য দেশ বা এলাকায় তাদের স্থানান্তরের কারণে (migration) সংখ্যাতাত্ত্বিক ভারসাম্য ব্যাপকভাবে নষ্ট হয়েছে । আযায় স্বাধীনতার পর জিয়াউর রহমান সরকারের আমলে সারা দেশ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালীদের পূর্ণবাসন করার ফলেও সেখানে সংখ্যাত্তাতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২। আর্থ-সামাজিক ঐতিহ্য:

বহু সামাজিক ও অর্থনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ব্যাপকভাবে হুমকীর সম্মুখীন হয়েছে । বস্তুতপক্ষে একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীর অস্থিত্ব শুধুমাত্র জনসংখ্যাতাত্বিক দিকের উপর নির্ভর করেনা বরং এর সাথে সাংস্কৃতিক সম্পর্কও থাকে । জাতি হিসেবে বাঙালী ও আদিবাসী উভয়ের আলাদা আলাদা সংস্কৃতি আছে। আমাদের একে অপরের সংস্কৃতিকে সম্মান করতে জানতে হবে। সরকারকেও সেই নিশ্চয়তা দিতে হবে যাতে তারাও স্বাধীনভাবে তাদের সংস্কৃতির বিভিন্নদিক পালন করতে পারে। ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যমে আমরা সকলে মিলেমিশে পথ চলব।

৩। বন ও উন্নয়ন পলিসি:

উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি এবং পলিসি গ্রহণের সময় আদিবাসীদের কথাও বিবেচনা করা উচিত । কারণ ঐতিহ্যগতভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ আদিবাসীরা ভোগ করে আসছে ।

৪। উন্নয়ন কর্মসূচি :

পরিকল্পনা প্রণয়নে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে । যেসব উন্নয়ন পলিসি গ্রহণ করা হবে সেগুলো যেন আদিবাসীদের নিজস্ব প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিনিধিত্ব করে ।

বর্তমানে বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসীদের বেঁচে থাকার সংগ্রামে সংকট তৈরি হয়েছে , কেননা সেখানে তথাকতিত উন্নয়ন কর্মসূচির নামে ব্যাপকভাবে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছে । প্রাকৃতিক সম্পদ , ভূমি , এবং বনের উপর আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে জাতীয় উন্নয়নের নামে কিংবা পরিবেশ ধ্বংস ইত্যাদির দোহাই দিয়ে ।

Dhaka University Institutional Repository

১.৪। গবেষণা পদ্ধতি:

ক) গবেষণার ক্ষেত্র:

রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান এই তিনটি পার্বত্য জেলা প্রস্তাবিত গবেষণার আওতায় এসেছে।

খ) নমুনা নির্বাচন:

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত আদিবাসী ও বাঙালী জনগণকে প্রস্তাবিত গবেষণায় নমুনা হিসেবে বাছাই করা হয়েছে।

গ) উপাত্তের উৎস:

প্রস্তাবিত গবেষণায় দু-ধরনের উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

১) প্রাথমিক উৎস:

প্রাথমিক উৎস হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী ও বাঙালী জনগণের নিকট হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক উৎস:

মাধ্যমিক উৎস হিসেবে বিভিন্ন বই পুস্তক, জার্নাল, গবেষণা প্রতিবেদন, সংবাদ পত্র, সরকারী বে-সরকারী পরিসংখ্যান ইত্যাদি থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

ঘ) উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি:

প্রস্তাবিত গবেষণায় সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার জন্য একটি প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

১.৫। গবেষণার যৌক্তিকতা:

প্রথমত মানবতার দিক থেকে রিফিউজি , আদিবাসী ও বাঙালীদের একত্রীকরণের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ , কেননা সরকারের কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের পরে তারা সীমানা অতিক্রম করেছে । যদি পূনর্বাসনের প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে করা না হয় তাহলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়বে ।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামে রিফিউজি ও IDPS (intermal displaced person)- দের পূনর্বাসন প্রক্রিয়াটিকে জননীতি প্রণয়নে প্রাধান্য দেওয়া উচিত ।

এই অঞ্চলের পরিস্থিতি এরকমভাবে চলতে থাকলে আঞ্চলিক নিরাপত্তার পাশাপাশি জাতীয়ভাবেও অচল অবস্থার সৃষ্টি হবে ।

রিফিউজিদের বিদ্রোহ ও বহির্গমনের প্রবণতা চলতে থাকলে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবনতি ঘটবে ।

আদিবাসীদের পূনর্বাসন করা না হলে তারা অসন্তুষ্ট হবে । আর তাদের অসন্তুষ্টি বিদ্রোহের সূচনা করতে পারে যেটা ভারত রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে ।

পরিশেষে বিচ্ছিন্ন মানুষদের একত্রীকরণ দেশের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য । এখনে একটি বিষয় লক্ষ্য করা উচিত যে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে অচল রেখে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব না।

১.৬। গবেষণার সীমাবদ্ধতা:

গবেষণা হলো একটি জটিল, নৈপুন্যভিত্তিক ও সময় সাপেক্ষ কাজ। এ কাজের জন্য প্রয়োজন নিজের স্বদিচ্ছা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, সময়, অন্যের সহযোগিতা এবং অর্থ। এই গবেষণা কাজটি করতে গিয়ে আমাকে বেশ কিছু সমস্যায় পড়তে হয়েছে। বিশেষ করে আমি যতবারই সেখানে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য গিয়েছি, নিজের নিরাপত্তার কারণে আমার সেখানে একা যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাছাড়া দীর্ঘদিন সেখানে অবস্থান করে তথ্য সংগ্রহ করাও আমার জন্য ছিল ব্যয়সাপেক্ষ। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলার মধ্যে খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে আমি সাধারণ মানুষের যতটা কাছে যেতে পেরেছি, যত সহজে তাদের মতামত জানতে পেরেছি, ততটা সহজ হয়নি রাঙ্গামাটিতে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা:

১। মেসবাহ কামাল
আরিফাতুল ফিবরিয়া: বিপন্ন ভূমিজ, অস্তিত্বের সংকটে আদিবাসী সমাজ
বাংলাদেশ ও পূর্বভারতের প্রতিচ্ছবি, গবেষক ও উন্নয়ন কালেকটিভ (আর ডি সি), পৃ:২৪৩

২। In 1981 and 1984 18,000 people crossed the border respectively. In the year 2000, Amnesty International reported that 50 % person of the hill people left to escape the meassacre, arbitory detention ad extrajudicial execution. On the other hand the USCR reported that about 64,000 people crossed the border to India and another 60,000 people became internally displaced person.

৩। Mohsin, Amena The Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, Lynne Rienner Published (2003) p. 72

৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু: অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত

মঙ্গল কুমার চাকমা

মেসবাহ কামাল
আরিফাতুল ফিবরিয়া: বিপন্ন ভূমিজ, অস্তিত্বের সংকটে আদিবাসী সমাজ
বাংলাদেশ ও পূর্বভারতের প্রতিচ্ছবি, গবেষক ও উন্নয়ন কালেকটিভ (আর ডি সি), পৃ:২৪৪

৫। দৈনিক প্রথম আলো, ২৫ মার্চ ২০০৯

৬। বাংলাদেশের মানচিত্র, http://topnews.in/law/files/Bangladesh-Map.jpg

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-প্রকৃতি

Dhaka University Institutional Repository

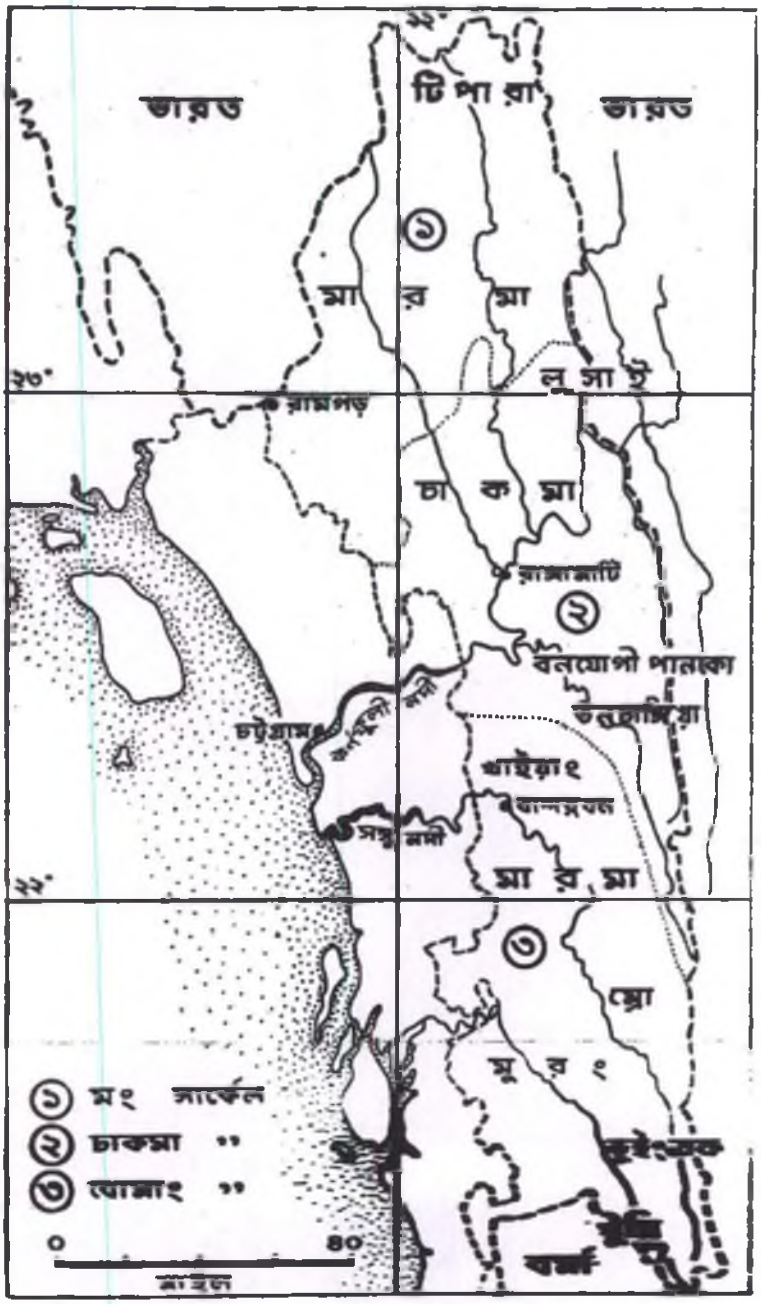

Dhaka University Institutional Repository

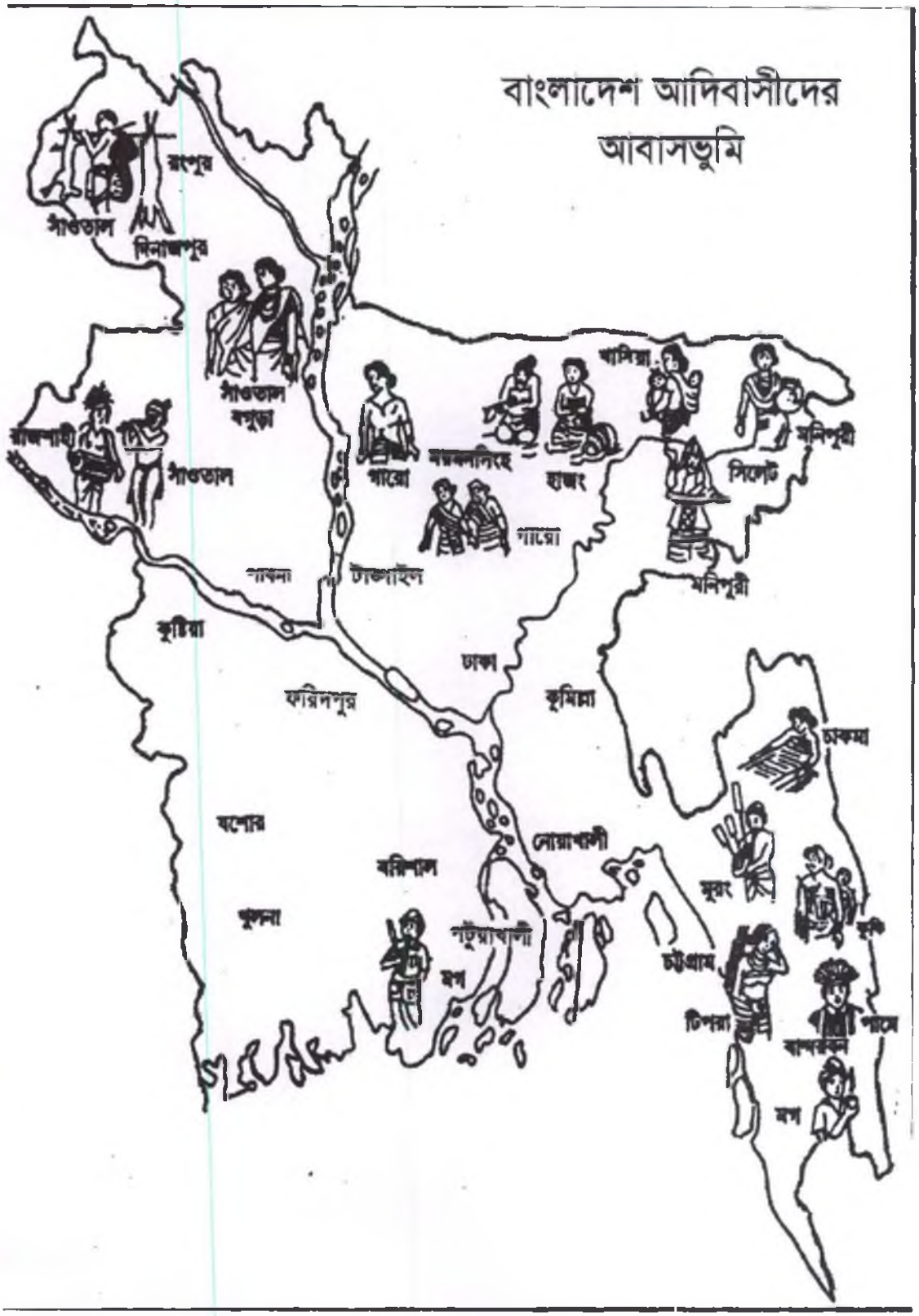

Dhaka University Institutional Repository

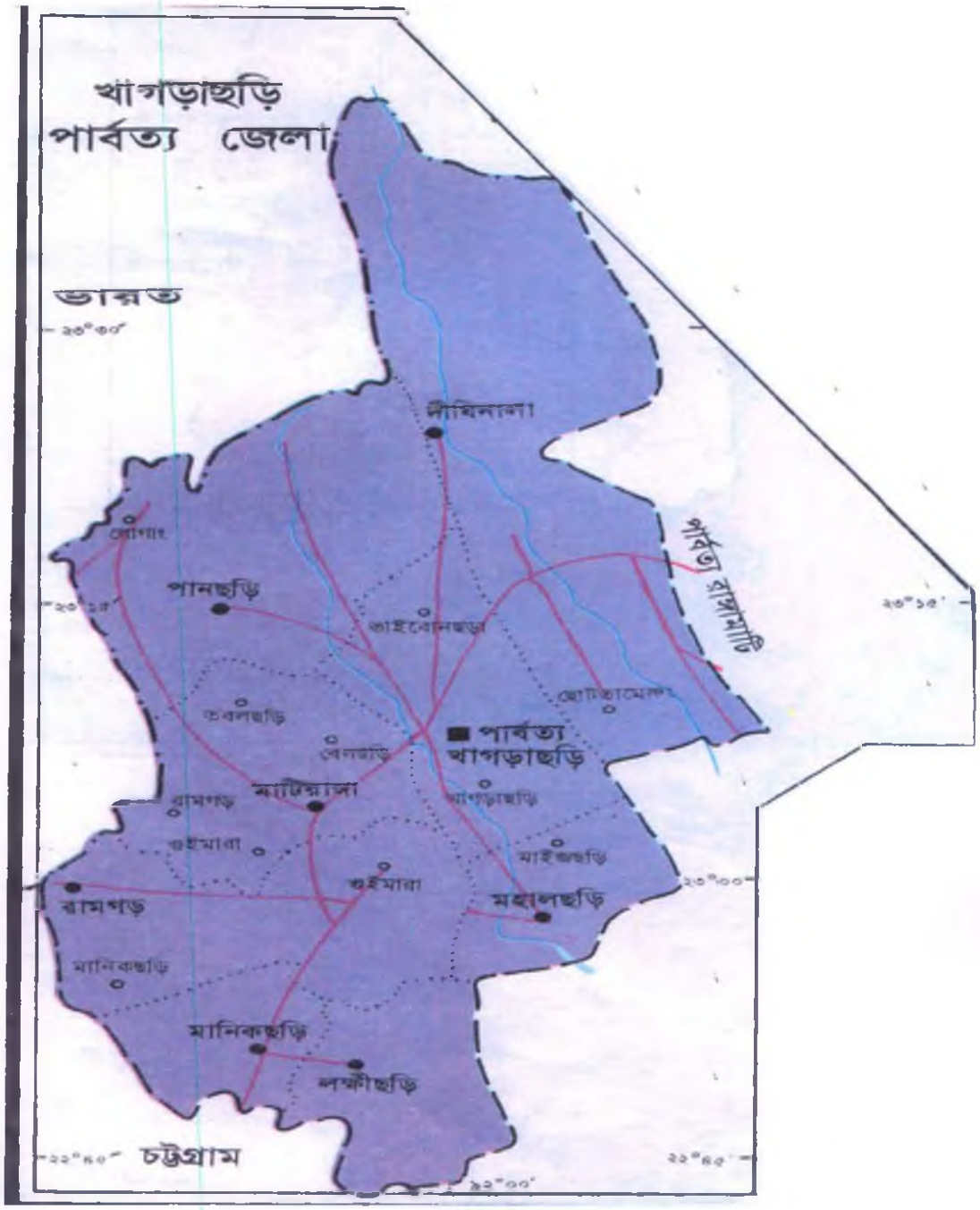

Dhaka University Institutional Repository

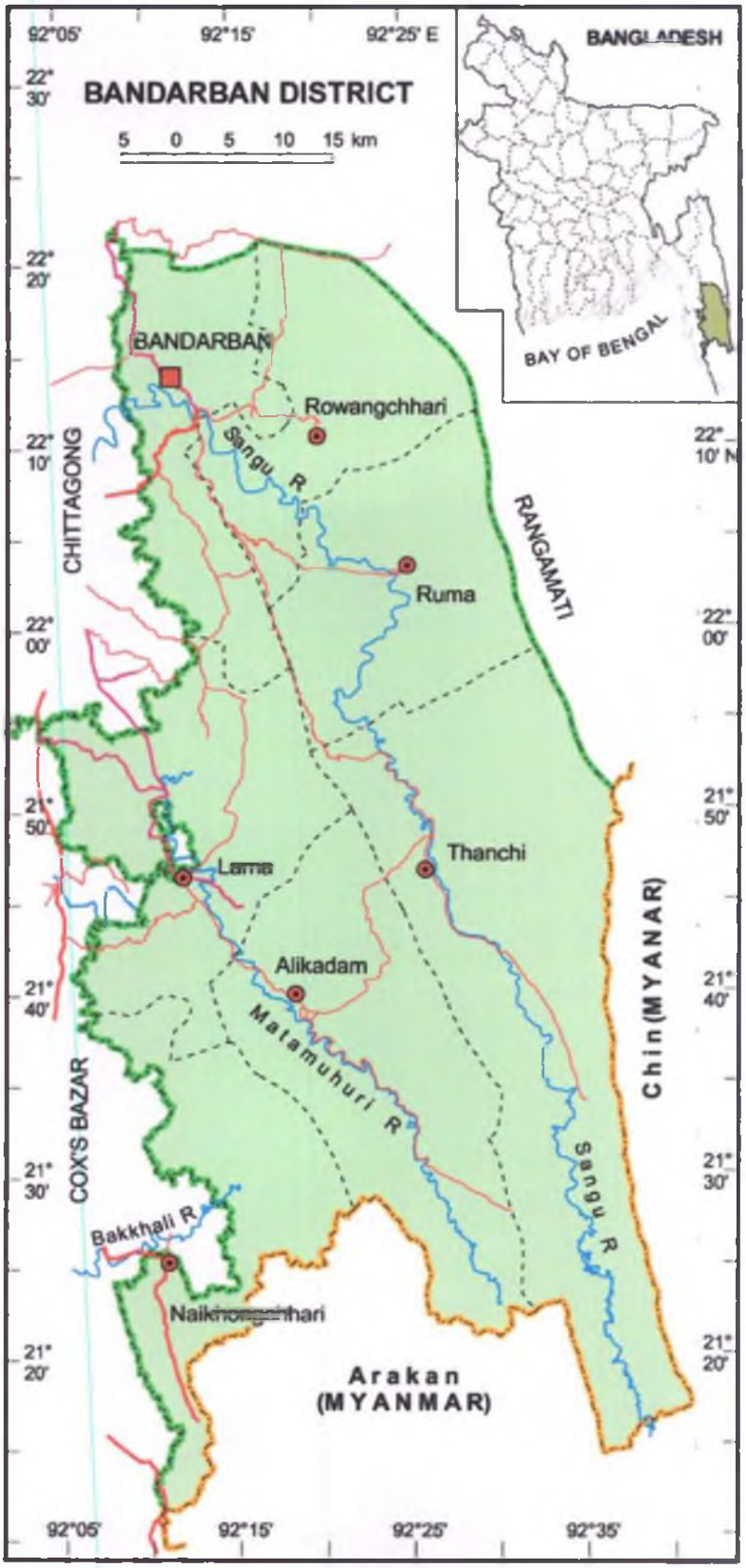

Dhaka University Institutional Repository

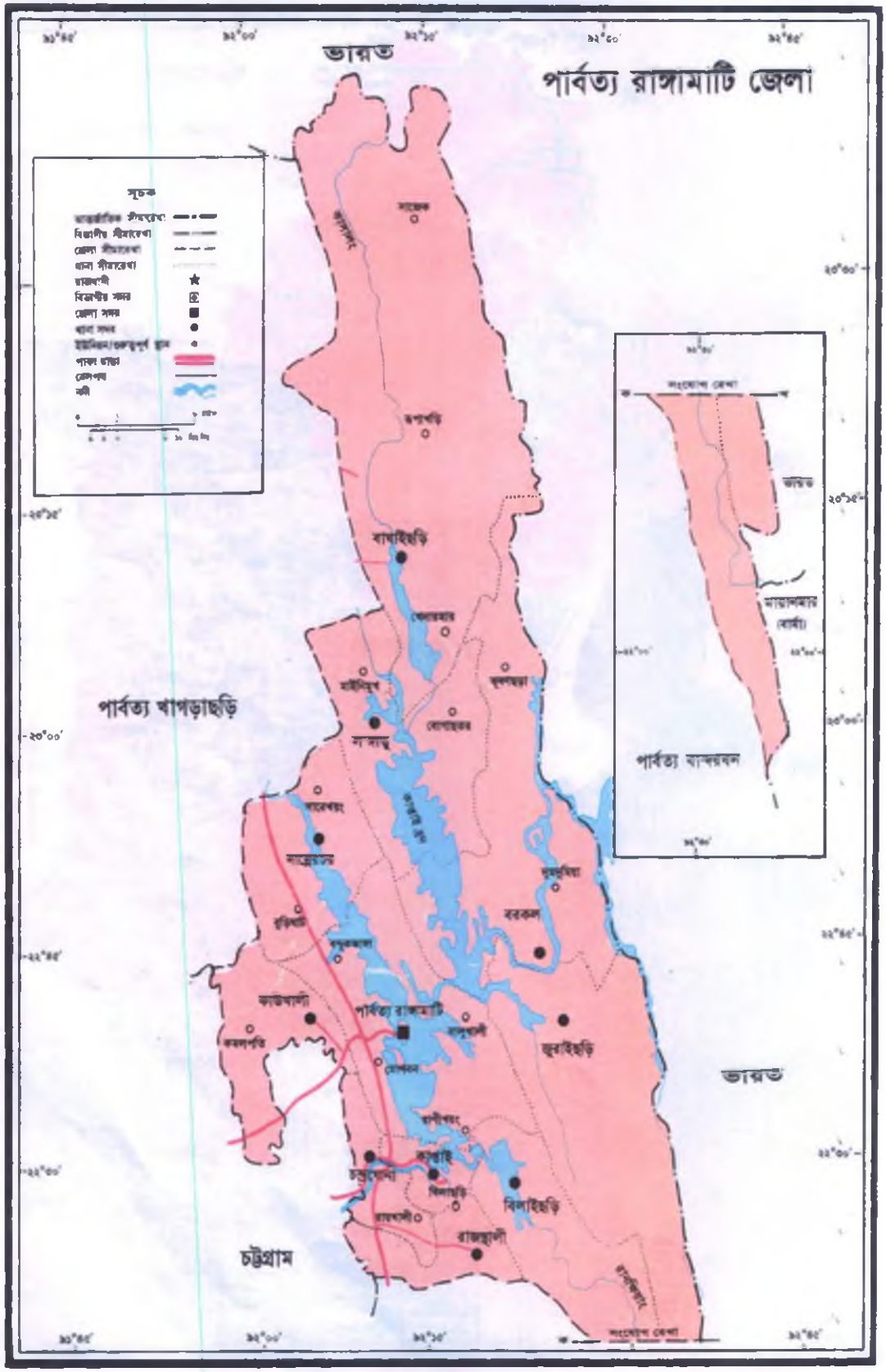

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-প্রকৃতি:

২.১ ভৌগলিক অবস্থান:

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উত্তর পশ্চিমাংশে, দক্ষিণ এশিয়ার পূর্বাংশে আর বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাংশে প্রায় ২১.১০° ডিগ্রী থেকে ২৩.৪৬° ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১.৪০° ডিগ্রী থেকে ৯২.৪২° দ্রাঘিমাংশ ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান। বাংলাদেশের প্রশাসনিক তিনটি জেলা রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ির মোট আয়তন ১৩,১৪৮ বর্গকিলোমিটার বা ৫,০৮৯ বর্গমাইল এলাকা যা পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্ভূক্ত [১] ।

সীমানা:

ভৌগলিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি পার্বত্য প্রদেশ ও মায়ানমারের পশ্চিম সীমান্তের সাথে সংযুক্ত। বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য ও আসাম রাজ্য, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য ও মিজোরাম রাজ্য, দক্ষিণ পূর্ব কোণে মায়ানমারের আরাকান প্রদেশ, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমে বাংলাদেশের সমতল উপকূলীয় চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা অবস্থিত।

ভূ-প্রকৃতি:

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-প্রকৃতি মূলত ভারত, মায়ানমার ও বাংলাদেশে বিস্তৃত সুবিশাল আরাকান ইয়োমা পর্বতমালার একটি ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে গঠিত। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে সমতল ভূমির গড় উচ্চতা ১২০ থেকে ১৩০ ফুট। সমগ্র এলাকাটি ফেনি, সাঙ্গু, মাতামুহুরী এবং এদের শাখা নদী ও উপনদীর উপত্যকা দ্বারা সুস্পষ্ট চারভাগে বিভক্ত হয়েছে। এসব উপত্যকা গুলো হচ্ছে চেঙ্গী উপত্যকা, কাসালং উপত্যকা, রাইনখিয়াং উপত্যকা এবং সাঙ্গু উপত্যকা। পর্বতগুলো এসব উপত্যকার সমান্তরালে উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত এবং উচ্চতা কয়েকশ ফুট থেকে কয়েক হাজার ফুট। সর্বোচ্চ শৃঙ্গ বিজয় তাজিন ডং অর্থাৎ গহীন অরণ্যে যে বন। এর উচ্চতা ৩১৮৫ ফুট। কেওক্রাডং এর উচ্চতা ২৯০০ ফুট যা এই পার্বত্যাঞ্চলে অবস্থিত দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পাহাড় [২] ।

Dhaka University Institutional Repository

আয়তন:

বাগড়াছড়ি, রাঙামাটি এবং বান্দরবান এই তিনটি জেলার সমন্বয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম। বৃটিশ আমল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত আয়তন নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

বৃটিশ ভারতে ইহার আয়তন ছিল ৬৮৮২ বর্গমাইল [৩]। (সীমান্ত কমিশনের রিপোর্ট মার্চ১৮৭৫), পাকিস্তান আমলের ১৯৫১ সালের আদমশুমারির রিপোর্টে আয়তন দেখা যায় ৫১৩৮ বর্গমাইল, ১৯৬১ সালের আদমশুমারির রিপোর্টে দেখা যায় ৫০৯৩ বর্গমাইল, বাংলাদেশ আমলের ১৯৮১ সালের আদমশুমারির রিপোর্টে দেখা যায় এর আয়তন ৫০৮৯ বর্গমাইল।

উল্লেখ্য যে, আয়তনের দিক দিয়ে এই পার্বত্য জেলাটি ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে যায় ১৭৯৩ বর্গমাইল। তথাপি ইহা বাংলাদেশের মোট আয়তনের প্রায় এক-দশমাংশ [৪]।

পাহাড়শ্রেণী:

পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড় গুলোকে দশভাগে ভাগ করা যায়। সুবলং, মায়ানী, কাসালং, হরিং, বয়কল, রাইনখীয়াং, চিম্বুক, মিরিঞ্জা ও বিজয় তাজিন ডং।

মাচার উপরে নির্মিত বসতবাড়ি

Dhaka University Institutional Repository

নদ-নদী:

পার্বত্য অঞ্চলের প্রধান নদী সাতটি। কর্ণফুলী, কাসালং, চেংগী, মাতামুহুরী, রাইনখীয়াং, মায়ানী, সাঙ্গু।

হ্রদ:

প্রাকৃতিক হ্রদ ও কৃত্রিম হ্রদ দুটোই এ অঞ্চলে দেখা যায়। রাইনখীয়াং, কাইন ও বগাকাইন হলো প্রাকৃতিক হ্রদ। অন্যদিকে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলী নামক নদীতে বাঁধ দেওয়ার ফলে সৃষ্ট হ্রদ কাপ্তাই একটি বৃহত্তম হ্রদের সৃষ্টি করেছে।

জলবায়ু:

জলবায়ু বিভাজনে পার্বত্য চট্টগ্রাম টিমহাম্লিং উদ্ভিদ মণ্ডলীর উষ্ণতা প্রধান অঞ্চলের অন্তর্গত। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২৫০ সেন্টিমিটার। গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা ৩০° সেলসিয়াস এবং শীতকালীন গড় তাপমাত্রা ২০° সেলসিয়াস। গ্রীষ্মকালে ৪০° থেকে ৪২° এবং শীতকালে ৪° থেকে ৫° পর্যন্ত তাপমাত্রা উঠানামা করে[৫]।

২.২ প্রশাসনিক ইউনিট:

পার্বত্য চট্টগ্রাম তিনটি জেলা ও পঁচিশটি থানা নিয়ে গঠিত। জেলাগুলো হলো বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি।

বান্দরবানে আছে ৭ টি থানা, যথা– বান্দরবান, রোয়াংছড়ি, রুমা, লামা, থানচি, আলিকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি।

খাগড়াছড়িতে আছে ৮ টি থানা, যথা– খাগড়াছড়ি, পানছড়ি, দিঘীনালা, মাটিরাঙা, রামগড়, মানিকছড়ি, মহালছড়ি ও লক্ষীছড়ি।

রাঙামাটিতে আছে ১০ টি থানা, যথা– রাঙামাটি, রাঘাইছড়ি, লংগুদ, বরকল, নানিয়ারছড়ি, কাউখালি, জুরাইছড়ি, কাপ্তাই, রাজস্থলি ও বিলাইছড়ি।

Dhaka University Institutional Repository

সার্কেল:

যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম বিভিন্ন আদিবাসী অধ্যুষিত সেহেতু প্রশাসনিক কাজকর্মের সুবিধার্থে Bengal Government ১৯০০ সালে এই বিস্তৃত পার্বত্য ভূমিকে তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করে প্রত্যেক সার্কেলের জন্য একজন করে রাজা বা প্রধান নিযুক্ত করেন[৬]। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতে মানচিত্রে সার্কেলগুলোর অবস্থান দেখানো হয়েছে[৬]।

২.৩ উদ্ভিদ ও প্রাণী:

পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্ধেকেরও বেশি ভূমি পাহাড়ী ও বনাচ্ছাদিত। বনভূমি একাধারে চিরসবুজ , পর্ণমোচি বৃক্ষ এবং ঘন ঝোপঝাড়ের সমন্বয়ে গঠিত। বনভূমিতে সেগুন, তেলসুর, তূন, গর্জন, গামার, জম্বল, চাপালিশ, কড়ই ইত্যাদি মূল্যবান বৃক্ষ এবং প্রচুর বাঁশ ও বেত জন্মে। বনভূমির মোট পরিমাণ প্রায় ৭০৪৬ বর্গকিলোমিটার। বনভূমিতে রয়েছে হাতি, বানর, বনগরু ইত্যাদি বন্যপ্রাণী এবং নানা প্রজাতির দুস্প্রাপ্য পাখ পাখালী, বাঘ এখন দুস্প্রাপ্য।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা:

১। Statistical Pocketbook of Bangladesh, B.B.S, 1991

২। পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ, চতুর্থ শ্রেণী, পৃষ্ঠা:৫১

৩। প্রকেসর পিয়েরে বেসাইন: পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি (অনুবাদ অধ্যাপিকা সুফিয়া খান), বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ:১

৪। ১৯৬১, ১৯৮১ ও ২০০১ সালের আদমশুমারীর রিপোর্ট অনুযায়ী।

৫। মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহীম বীর প্রতীক: পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ পরিস্থিতি মূল্যায়ন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা:১৮

৬। প্রকেসর পিয়েরে বেসাইন: পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি (অনুবাদ অধ্যাপিকা সুফিয়া খান), বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ:১০

৭। মানচিত্র

ক) প্রকেসর পিয়েরে বেসাইন: পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি গ্রন্থ থেকে নেওয়া।

খ) আদিবাসীদের আবাসভূমি– পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ, চতুর্থ শ্রেণী গ্রনথ থেকে নেওয়া।

গ) খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলা– মানচিত্রের বই গ্রাফোসম্যান

ঘ) বান্দরবান জেলা– http://limana.files.wordpress.com/2008/11/mb_0101.gif

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর বিবরণ

Dhaka University Institutional Repository

নিজস্ব গহনায় সজ্জিত আদিবাসী নারী

আদিবাসী পথশিশু, যারা স্বপ্ন দেখে স্কুলে যাওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

আজও তারা নিজেদের খাদ্য করে সংগ্রহ নিজেরাই

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর বিবরণ:

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জনগোষ্ঠী মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত, যথা– আদিবাসী ও অ-আদিবাসী অর্থাৎ বাঙালী। বাঙালীরা সমভূমি থেকে গিয়েছে এবং তাদের অধিকাংশই মুসলমান। অবশ্য কিছু কিছু হিন্দু পরিবারও আছে। বাঙালীদের অধিকাংশই সরকারের অভিবাসন প্রক্রিয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস শুরু করে। বিশেষ করে পাকিস্তান আমলে এদের সংখ্যা ক্রমানুপাতিক হারে বেড়ে যায়। অন্যদিকে কিছু বাঙালীসহ কিছু পাহাড়ী মনে করে তারাই এ অঞ্চলে আদিম।

প্রকৃতঅর্থে আদিবাসী বলতে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম ভাবধারা বহন করে যারা আজো বেঁচে আছে তাদেরকে বোঝায়। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের পুরোপুরি আদিম বলা যায়না। কারণ তারা সভ্যজগৎ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। তবে কিছু কিছু আদিবাসী এখনো দূর্গম পাহাড়ী এলাকায় বাস করে। বস্তুত এরা সবাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এদের পারিবারিক গঠন পদ্ধতীও কিছুটা হিন্দুদের মতো। এতেই প্রমাণিত হয় যে, এরা অনেকদিন ধরেই সভ্যসমাজের প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত। তাদের নৃ-তাত্ত্বিক ও সংস্কৃতিতে সমভূমি অঞ্চলের লোকেদের সাথে যেমন রয়েছে অমিল তেমনি আবার জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বন্টনের দিক থেকেও সমভূমির অঞ্চলের সাথে রয়েছে বৈসাদৃশ্য। নৃ-তাত্ত্বিক ও জাতি-তাত্ত্বিক গবেষণা থেকে একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, পার্বত্য অঞ্চলে বসবারত কোনো জনগোষ্ঠীই এখানকার মূল আদিবাসী (Aborigins) বা ভূমিপুত্র (Son Of The Soil) দাবিদার হতে পারেনা [১]। এখানকার বাঙালীরা যেমন সমভূমি থেকে গিয়েছে তেমনি আদিবাসীরাও ত্রিপুরা, আরাকান প্রভৃতি অঞ্চল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিবাসীত হয়েছে। কারো ইতিহাস প্রাচীন আর কারো ইতিহাস আধুনিক। Captain T.H.Leuin এর মতে , "A great portion of the hill tribes at present living in the Chittagong hills, undoubtedly came about two generation ago from Arakan.This is asserted both by their own tradition and by records in the Chittagong collectorate."[২]

Dhaka University Institutional Repository

৩.১ আদিবাসী কারাঃ

আদিবাসী শব্দটি এসেছে সংস্কৃতি শব্দ থেকে। আদী অর্থ 'মূল" এবং বাসী অর্থ "অধিবাসী"। সুতরাং আদিবাসী কথাটির অর্থ ধরা যায় "দেশীয় লোক" (Indigenous) হিসাবেও। ইদানিং প্রতিবেশী দেশ ভারতেও আদিবাসী শব্দটির একটি প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে, যাকে জনপ্রিয় করার চেষ্টাও করা চলছে। সেটি হচ্ছে "বনবাসী" (Forest Dwellers)। কিন্তু এরা সাধারণ মানুষের থেকে ভিন্ন কিছু নয়, ভিন্নতা হলো তাদের বসবাসে, কেননা ভারতে অনেকেই জঙ্গলে বাস করে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এখন ভিন্ন। আদিবাসীরা এখন বরেন্দ্র অঞ্চলের বাসিন্দা, বনবাসী নয়, লোকালয়ের অধিবাসী। তবে অন্যান্য আদিবাসীদের মতো তারাও তাদের নিজস্ব বা আদী-অধিবাসীর মতানুসারে জীবনযাপন করছেন।

আদিবাসী বলতে বোঝায় এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা মোটামুটি ভাবে একটি অঞ্চলে সংগঠিত, যাদের মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং যার সদস্যরা মনে করেন যে, তারা একই সাংস্কৃতিক এককের অন্তর্ভূক্ত। এখানে মূলত সংস্কৃতির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, কেননা সমজাতীয় সংস্কৃতিই আদিবাসীদের মৌলিক বৈশিষ্ঠ্য, এরা হচ্ছেন একটি সাংস্কৃতিক একক। প্রাচীনকালের শাসক সংস্কৃতিতে আদিবাসীদের মনুষ্যজাতি বলে অস্বীকার করা হয়েছে। ধর্মীয় বিভিন্ন গ্রন্থ তাদের বিভিন্ন জীবজন্তু নামে আখ্যায়িত করেছে। তাদেরকে দাস রূপে চিহ্নিত করেছে। এমনকি তাদের দস্যু হিসেবেও গণ্য করা হয়েছে। এরপর বৃটিশরা আদিবাসীদেরকে "আদিম অধিবাসী" "অনগ্রসর অধিবাসী" ইত্যাদি বিশ্লেষণে বিশেষিত করেছে। কিন্তু আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে এগুলো কোনো গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা নয়।

১৯৮৯ সালে গৃহীত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-র ১৬৯ নম্বর কনভেনশনে ১ নম্বর আর্টিকেলে আদিবাসীদের সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এভাবে–

A) "Tribal people in independent countries (are those) whose social, cultural and economic conditions distinguish them sections of national community and whose status in regulated wholly or partially by their own special laws or regulations."

B) "peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country,

Dhaka University Institutional Repository

or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest colonisation or the establishment of present state boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions."

সাধারণ কথায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সংজ্ঞা অনুসারে আদিবাসী হলেন তারাই যাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় কম অগ্রসর। জীবনধারাও আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিচালিত হয় তাদের নিজস্ব প্রথা ও ঐতিহ্য অনুসারে, তাদের নিজেদের অথবা বিশেষ কোনো আইন বা নিয়ম দ্বারা। একটি স্বাধীন দেশের মানব সম্প্রদায়, যারা বর্তমান রাষ্ট্রসীমা নির্ধারিত হওয়ার পূর্ব থেকে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছেন , যাদের নিজেদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে, একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে সে দেশে বসবাস করেন, অথচ দেশের জাতীয় কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেরনা তারাই হচ্ছেন আদিবাসী।

ভাষাবিদ ডঃ অনিমেষ কুমার পাল আদিবাসীদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, " যে সমস্ত সম্প্রদায় আদীকাল থেকে পাক-ভারত উপমহাদেশে বসবাস করে আসছেন এবং যাদের জীবনধারা এই বিংশ শতাব্দীর চরম শিখরেও আদিম পদ্ধতীতে পরিচালিত হচ্ছে তারাই আদিবাসী নামে পরিচিত।"

অন্যদিকে প্রশান্ত ত্রিপুরার মতে, " কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু বা আদিবাসী বলার অর্থ হচ্ছে যে, তারাই সেই নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের প্রাচীনতম সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বংশধর। কীভাবে স্থান, কালের সীমানা নির্ধারণ করা হচ্ছে তার উপরেই নির্ভর করছে কোন প্রেক্ষিতে এবং কাদের আমরা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বলবো।" এই যে স্থান কালের সীমানা নির্ণয়ের বিষয়টি, এর হেরফের আমরা দেখতে পাবো আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়ার বিভিন্ন দেশের জনসমাজের বিভিন্ন অংশ অভ্যন্তরীন ঔপনিবেশিকতার শিকারে পরিণত হচ্ছেন। এধরনের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিশেষ করে সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামজিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে যাদের আলাদা ভাবে সনাক্ত করা যায়, তারাই হচ্ছেন আদিবাসী।

জাতিসংঘও তার সংজ্ঞায় Indigenous কথাটির এক ধরনের সম্প্রসারিত অর্থ দ্বার করাতে চেয়েছে। তাই এক্ষেত্রে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাদের পূর্বপুরুষরা প্রথম বসতি গড়ে তোলে সে প্রশ্ন একটি অবান্তর প্রসঙ্গ।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী এবং নৃ-বিজ্ঞানী আদিবাসীদের সংজ্ঞায়িত করেছেন বিভিন্ন ভাবে। তাদের কারো কারো মতে আদিবাসী বলতে এমন এক জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যারা তাদের জীবিকার জন্য খাদ্য সংগ্রহ, কৃষি উদ্যান ও পশুপালনের উপর নির্ভরশীল। এখানে অর্থনৈতিক কৌশলের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে [৩]।

৩.২ আদিবাসীর সংজ্ঞাঃ

"আদিবাসী বলতে সাধারণত মানব গোষ্ঠীর ছোট বড় অনগ্রসর প্রাচীন বা আদিম সংস্কৃতিবিশিষ্ট গোষ্ঠী বোঝায়।" পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অপেক্ষাকৃত প্রাকৃতিক পরিবেশে ও গভীর অরণ্যে এরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। বাংলাদেশেও আমরা তেমনটি দেখতে পাই। এখানেও প্রধান প্রধান বেশ কয়েকটি গোষ্ঠী বসবাস করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাহাড়ী এলাকায়। এদের জীবনযাত্রা সহজ-সরল, জীবনধারণের চাহিদা কম এবং জীবনযাত্রাও সভ্য মানুষের তুলনায় অনেকখানি মন্থর। তবে আধুনিক সমাজের নূতন নূতন অবস্থা ও সমস্যার চাপে এদের জীবনযাত্রায় আলোড়ন দেখা দিয়েছে। তারাও এখন লেখাপড়া শিখছে, শহরে বসবাস করার দিকে ঝুঁকছে। বাংলাদেশ সরকার তাদের উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এমনকি চাকরীর ক্ষেত্রেও রেখেছে ৫% কোটা ব্যবস্থা।

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর সেই মহাদেশে যারা বসতি স্থাপন করেছে তাদের পূর্ববর্তী জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী বলা হয়। অস্ট্রেলিয়ায় শ্বেতাঙ্গ জাতির অভিবাসনের আগে যারা বসতি করে আসছে তাদের আদিবাসী বলা হয়। বর্তমান বিশ্বের উন্নত মানবগোষ্ঠী আদিবাসীদের উত্তম পুরুষ।
আদিবাসীদের মধ্যে গোষ্ঠী প্রীতি ও গোষ্ঠী সচেতনতা খুব বেশি। বিশেষত আত্মরক্ষার জন্য দলবদ্ধভাবে আক্রমণ বা অভিযান চালানো তাদের একটি বৈশিষ্ট্য। নিজেদের সংস্কৃতি ও সমাজ কাঠামো বজায় রাখার ব্যাপারে এরা খুব সচেতন। সামাজিক বিধিনিষেধ রক্ষার জন্যও নিজেদের অভ্যন্তরীন সরকার ব্যবস্থা আছে। চেহারা ও সমাজের ধাঁচ, বিশ্বাস ও শিক্ষা, ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঐক্য, দৃঢ় অনড় বন্ধন লক্ষ্য করে এদের সহজে চেনা যায়।

আদিবাসীদের সামাজিক কাঠামো নানারকম হয়ে থাকে। জনসংখ্যা অনুসারে এক একটি সমাজ কয়েকটি দলে বিভক্ত থাকে। দলের সবচেয়ে ছোট সংস্থা হলো পরিবার। প্রতিটি দল নিজেদের নিরাপত্তা বজায়

Dhaka University Institutional Repository

রাখতে সচেষ্ট থাকে। কোনো কোনো আদিবাসী সমাজে যাযাবর দল রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার কুকিরা অনেকটা যাযাবর। কোনো কোনো আদিবাসী দুই দলে বিভক্ত। দল দুটি সামাজিক মর্যাদায় সমান নয়। এক দল আর এক দলের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়না। আবার দল গুলো কতগুলো গোত্র বা কুলে (Clam) বিভক্ত থাকে । কুকি, ওড়াঁও এরকম আদিবাসী।

আদিবাসীদের মধ্যে নিজস্ব শৃংঙ্খলা রক্ষার জন্য নিজস্ব সরকার ব্যবস্থা আছে। অনেক সময় বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বা মাতব্বর অথবা বিশেষ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তি মণ্ডলীর হাতে এই দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। এরা সমাজের শৃংঙ্খলা রক্ষা করে। ধর্মীয় উৎসব, সামাজিক উৎসব ও বিবাহ এদের নির্দেশে অনুষ্ঠীত হয়। সমাজের প্রতিটি কিশোর কিশোরীর জন্য আদিবাসীদের মধ্যে নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। আবার বৃহত্তম সমাজের ভাষা ও শিক্ষাদীক্ষাও তারা গ্রহণ করে। এজন্য আদিবাসী সমাজের নিজস্ব ভাষার সঙ্গে তারা বৃহত্তম সমাজের অর্থাৎ জাতীয় ভাষাতেও শিক্ষা গ্রহণ করে।

এদের কোনো কোনো সমাজ পিতৃতান্ত্রিক আবার কোনো কোনো সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর বাড়িতে চলে যায়। পিতার পরিচয়ে সন্তানদের পরিচয় হয়। আর মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে স্বামীই স্ত্রীর পিত্রালয়ে গিয়ে বসবাস করে। মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের সন্তান-সন্ততিরা মাতামহির কুল, বংশমর্যাদা ও সম্পত্তির উত্তরাধীকার পায়।

আদিবাসীদের ধর্ম বিশ্বাসকে "জরাপসনা" বলে। আদীম মানুষ প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে শক্তি বা প্রাণের কল্পনা করতো। জীবনযাত্রার সফলতার জন্য নানা অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি দিয়ে তারা তাই অশরীরী বা অতি-প্রাকৃত শক্তির তুষ্টি বিধানে নানা ধর্মকর্ম, আচার-অনুষ্ঠান করতো। জরমন্ত্র, জাদুপূজা তাই তাদের সমাজ জীবনে বড় একটি স্থান দখল করে আছে। আবার কোনো কোনো আদিবাসী দীর্ঘদিন ধরে প্রধান কোনো ধর্ম পালন করলেও নানারকম প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে।আদিবাসীদের ধর্মীয় বিশ্বাসে হিন্দুদের অনেক কিছুই আছে। চাকমা, মারমা, তংচংগারা বৌদ্ধ ধর্মাবলী। মনিপুরী ও ত্রিপুরারা হিন্দু। নাগা, কুকি, পাংখো, বনযোগী, ম্রোদের মধ্যেও হিন্দু ধর্মের প্রভাব রয়েছে। আবার বহু আদিবাসী খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। চাকমাদের নামের ক্ষেত্রে দেখা যায় বাঙালী প্রভাব। তাদের রাজ পরিবারের

Dhaka University Institutional Repository

উপাধি "রায়"। এই উপাধি বৃটিশরা প্রদান করেছে। আজকাল কোনো কোনো আদিবাসী এরকম রায় বা চৌধুরী উপাধি গ্রহণ করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন আদিবাসীর মধ্যে মঙ্গোল ও ভোটবর্মী জাতির প্রভাব রয়েছে। এদের মঙ্গোল জাতি থেকে উদ্ভুত আদিবাসী বলে গণ্য করা হয় [৪]।

৩.৩ বাঙালী জাতির আদি পরিচয়ঃ

বাংলাদেশ নামের এ ভূ-খণ্ডটি মহাসাগরের অংশ হিসেবে একসময় সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। মৃত্তিকাবিজ্ঞানীদের মতে, প্রায় ৭ থেকে ২৫ কোটি বছর আগে এখানে ভূমি গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রথমে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, লুসাই ও গারো অঞ্চল সমুদ্রগর্ভ থেকে জেগে ওঠে। একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, দার্জিলিং, আসানসোল ইত্যাদি স্থানের অভ্যুদয় ঘটে। পরবর্তী সময়ে প্রায় ৩.৫ কোটি বছর আগে কুমিল্লার লালমাই পাহাড় অঞ্চল, বরেন্দ্রভূমি ও মধুপুর অঞ্চল ধীরে ধীরে জেগে ওঠে। সর্বশেষ ভূমি গঠনের প্রক্রিয়া দক্ষিণ অঞ্চল গুলোতে শুরু হয়। এখনও আমাদের দেশে ভূমি গঠন প্রক্রিয়া চলছে। প্রাকৃতিক নিয়মে যেমন ভূমিগঠন প্রক্রিয়ায় বাঙলার সীমানা বাড়ছে তেমনি রাজনৈতিক কারণেও অনেক সময় এর সীমানার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। স্বাভাবিক ভাবেই ধারাণা করা হয়, যেখানে যত আগে ভূমির সৃষ্টি হয়েছে সেখানে তত আগে মনুষ্য বসতি গড়ে উঠেছে। প্রতিকূল ও বৈরী পরিবেশের কারণে এ অঞ্চল মানুষের বসবাসের উপযোগী ছিলনা। দূর্গম পাহাড়ী এলাকায় শ্বাপদসঙ্কুল এক প্রাকৃতিক পরিবেশ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এর চেয়েও বৈরী প্রাকৃতিক পরিবেশের শিকার হয়েই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ এ অঞ্চলে ছুটে এসেছিল বাঁচার তাগিদে।

ধারণা করা হয় খ্রীষ্টপূর্ব ১০ হাজার বছরেরও আগে সর্বপ্রথম নেগ্রিটো জাতের মানুষ বাঁচার তাগিদে এ অঞ্চলে এসেছিল। হিমালয় তাদের উত্তরের বাতাস থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম দিক দিয়ে এরা এসেছিল। কালো, নাক থ্যাবড়া, চুল কোকড়ানো নেগ্রিটো জাতি ভীষণ কঠিন সময়ে এদেশে আসে যখন এটি ছিল দূর্গম পাহাড়ী এলাকা। পাথর যুগে এরা পাহাড়ী এলাকায় বসবাস শুরু করে। পাথর, গাছের ডাল ইত্যাদি দিয়ে এরা জীবজন্তু শিকার করে জীবন ধারন করতো। এরা ছিল অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু জাতি। তাদের এই বৈশিষ্ট্য আজো বাঙালীদের শরীরে বইছে।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর এদেশে আসে অস্ট্রালয়েড জাতি। অস্ট্রালয়েডরা এদেশে কৃষি প্রবর্তণ করেছিল যা আমাদের জন্য এখনও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। গর্বের বিষয় এটাই হচ্ছে পুরো ভারতবর্ষের প্রথম কৃষি। খড়ের ঘর তৈরিও এদের প্রথম আবিষ্কার।

অস্ট্রালয়েডদের পর এদেশে আসে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হতে দ্রাবিড় জাতি। নগর সভ্যতার পত্তন দ্রাবিড়দেরই কৃতিত্ব। সিন্ধু সভ্যতা দ্রাবিড়দেরই সৃষ্টি বলে ধারণা করা হয়। আমাদের দেশে প্রাচীনতম নগরী গড়ে ওঠে বগুড়ার মহাস্থানগড়ে।

দ্রাবিড়দের পর আসে এ্যালপাইনরা। এরা ছিল দেখতে সুশ্রী। তারও পরে খ্রীষ্টপূর্ব দেড় থেকে দুই হাজার বছর আগে এদেশে আসে ইন্দোইউরোপীয় দূধর্ষ আর্য জাতি। উত্তর পূর্ব দিক থেকে এরা আসে এদেশে। আর্য শব্দের অর্থ হচ্ছে সভ্য। এরা নিজেদের সভ্য জাতি বলে মনে করতো এবং বাদবাকি সবার নাম দিয়েছিল অনার্য জাতি। তারা দ্রাবিড়দের হটিয়ে দিয়ে নিজেদের এ অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। যেহেতু বাঙালীর শরীরে বইছে বিভিন্ন পূর্বপুরুদের মিশ্রিত রক্তের ধারা, সেহেতু আমরা একই জাতি বা এক সমাজের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কেউ কালো, কেউ বা ফর্সা, কেউ আবার লম্বা, কেউ বা খাটো। তাই শংকর জাতি বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে দেখা যায় নানারকম বৈপরিত্যের যহিঃপ্রকাশ [৫]।

ঐতিহাসিক কালেরও বহু আগে প্রত্ন-প্রস্তর যুগ থেকেই পাক-ভারত উপমহাদেশে নানা জনগোষ্ঠীর নানা জনস্রোত ঢেউয়ের মতো ভেঙ্গে পড়েছে বারবার। আফ্রিকার মিশমিশে কালো নিগ্রো প্রতিম মানুষের দল সবার আগে আসে এবং সবার শেষে আসে একেবারে হাল আমলে ঔপনিবেশিক শাসক হিসেবে আধুনিক ইউরোপীয়রা। এই দুই প্রান্তের মাঝে এসেছে আরো অনেকে। আধুনিক ইউরোপীয়রা ছাড়া সবাই উপমহাদেশের বুকে বাসা বেধেঁছে স্থায়ীভাবে। পূর্বতন জনগোষ্ঠীর রক্তের সাথে নিজেদের রক্তধারা মিশিয়েছে। মেশামিশি হয়েছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আচার ধরনের সাথে। একের বিশিষ্ট্যতার সাথে অপরের বৈশিষ্ট্য মিলেমিশে সৃষ্টি হয়েছে নূতন জীবনধারা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগে এদেশে প্রথমে আসে খর্বকায় নিগ্রো প্রতিম জাতি। আফ্রিকা থেকে আরব উপদ্বীপ হয়ে পারস্যের উপকূল বেয়ে তারা এই উপমহাদেশে প্রবেশ করে এবং ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। পূর্ব আসামের নাগাদের মাঝে আজো এই নিগ্রোপ্রতিম লোকেদের রক্তধারার অস্তিত্ব বিদ্যমান।

নিগ্রো প্রতিম বা নেগ্রিটোদের পরে আসে আদী অস্ট্রেলিয় বা অষ্ট্রিকরা। মধ্যমাকৃতির লম্বা মাথাওয়ালা এই জনগোষ্ঠী আসে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে, প্রত্ন-প্রস্তর রীতি, সংস্কৃতি নিয়ে। শুধু উপমহাদেশে নয়, আরব আফগানিস্তান থেকে শুরু করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সুমাত্রা, জাভা, অস্ট্রেলীয়া, মেলোনেশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। মধ্যমাকৃতির এই জনগোষ্ঠীর বহু চিহ্ন আজো এসব দেশের লোকেদের চেহারার মাঝে ছড়িয়ে আছে। বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ায় এদের চেহারার আদলে যেমন বিভিন্নতা দেখা দেয়, তেমনি বিভিন্নতা দেখা দেয় ভাষায়। এই বিভিন্ন ভাষা মিলে যে গোষ্ঠী তারই নাম অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠী। অষ্ট্রিক কোনো জনগোষ্ঠীর নাম নয়, আর্য বা দ্রাবিড়দের মতো ভাষাগোষ্ঠীর নাম। উপমহাদেশে কোল-মুণ্ডা ও নিকোর দ্বীপের কথিত ভাষা অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত। এই উপমহাদেশেই এই জাতীয় লোকেরা প্রথম হাতি পোষ মানাতে শেখে।

অষ্ট্রিকদের পর আসে দ্রাবিড়ভাষী লোকেরা। এরাও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হতে এ উপমহাদেশে প্রবেশ করে। জনতত্ত্বের বিচারে এরা এবং অষ্ট্রিকরা একই গোষ্ঠীর অন্তর্গত। প্রাচীন তামিলরা প্রায় দেড় থেকে দুই হাজার বছরের পুরোনো। দ্রাবিড়ভাষীরা আসে তারও প্রায় দুই কী তিন হাজার বছর আগে।

উপমহাদেশে আরো একটি জনধারা প্রবাহিত হয়েছিল যাদের আগমনকাল, ভাষা আজও সঠিকভাবে অনুমান করা যায়নি। এরাও আর্যভাষী বা দ্রাবিড়ভাষীদের মতো পশ্চিম দিক দিয়ে এই উপমহাদেশে প্রবেশ করে। নৃ-তাত্ত্বিক বিচারে এদের নাম Western Brachy Cephals বা পশ্চিমী চওড়া বা গোলমাথা জনধারা।

প্রাগ-ঐতিহাসিক কালে আর্যভাষী নর্ডিক বা মঙ্গোলরা আসে পরে। অনুমান করা হয় দীর্ঘ মুণ্ড নর্ডিকরা যখন আর্যভাষী হয়ে উঠেনি তখন তাদের আদি নিবাস ছিল বর্তমান রাশিয়ার অন্তর্গত উরাল পর্বতমালার দক্ষিণে ইউরোপীয় মালভূমিতে। এই নর্ডিরা ছিল পশুপালক। এখানেই তারা পশুকে পোষ মানায়।

Dhaka University Institutional Repository

খ্রীষ্টজন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে নিজেদের আবাসভূমি ছেড়ে এরা দক্ষিণে চলতে শুরু করে। মেসোপটেমিয়ায় আসে খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার সালের কাছাকাছি সময়ে। এখানে তারা গরুকে পোষ মানায়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে তারা সংগ্রহ করে ছাগল। মেসোপটেমিয়ায় প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় এ সময়ে আর্যদের বিভিন্ন শাখা এখানে অনেক গুলো বসতি স্থাপন করেছিল। মেসোপটেমিয়ায় আর্য বসতি স্থাপনের সমসাময়িক কালেই ইরানেও আর্য বসতি স্থাপিত হয়। নিজেদের প্রচণ্ড সংঘ শক্তি, রীতিনীতি, বিশ্বাস প্রভৃতি নিয়ে আর্যভাষী নর্ডিকদের একটি শাখা পাক-ভারত উপমহাদেশে আসে খ্রীষ্টজন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে।

প্রাগ-ঐতিহাসিক কালে যেসব জনধারা উপমহাদেশের মাটিতে এসে বসতি গড়ে তোলে তাদের মধ্যে মঙ্গোলরাই বোধ হয় সর্বশেষ। মঙ্গোলরা সব একসাথে আসেনি। বিভিন্ন শাখার মঙ্গোলরা বিভিন্ন সময়ে এসেছে, বারে বারে, প্রথম বেদ সংকলনের সময় আনুমানিক খ্রীষ্টজন্মের হাজার বছর আগে। উপমহাদেশে উত্তর ও উত্তরপূর্ব দিকে সে সময়ে যে মঙ্গোল প্রতিম জাতির বসবাস ছিল প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে তার প্রমান বিদ্যমান। মহাভারতেও এর উল্লেখ আছে।

ঐতিহাসিক কালেও একইভাবে বিভিন্ন জনধারার আগমন বন্ধ হয়নি কখনো। ঐতিহাসিক কালে যারা এসেছে তাদের তালিকাও কম নয়। এসেছে অ্যাসেরিয়, এ্যালামাইট আক্রমণকারীরা, পারসিকরা, মেসিডোনীয় ও গ্রীকরা, সিরীয়, ফিনিশীয়, শক ও কুশানরা, হুন ও প্রাগ-ইসলামিক তুর্কিরা। পরবর্তী কালের আরবীয়, কুর্দি, ইরানী, আফগান, মোঘলরা এবং হাল আমলের আধুনিক ইউরোপীয়রা। এভাবেই জনধারার আগমন অব্যাহত রয়েছে।

ঐতিহাসিক কালের যেসব জনধারার কথা এখানে উল্লেখ করা হলো তারা সবাই এ উপমহাদেশের রক্তধারায় সমান ভাবে প্রভাব রেখে যেতে পারেনি। প্রাগ-ঐতিহাসিক কালে জনগোষ্ঠীর যেসব স্রোত এখানে এসেছিল ঐতিহাসিক কালের প্রারম্ভেই মোটামুটি তাদের সংমিশ্রণে তৈরি হয়ে গিয়েছিল উপমহাদেশের মানুষের রক্তধারা, চেহারার আদল। পরবর্তী সময়ে এই রক্তধারা আর চেহারার সাথে অন্য জনগোষ্ঠীর মেশামিশি সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার ছাপ পড়েছে খুবই কম।

Dhaka University Institutional Repository

আবার এই উপমহাদেশের সব জায়গার অবস্থাও একরকম না। সব জায়গায় একই মাত্রায় রক্তের মেশামিশি হয়নি। ফলে উপমহাদেশেও দেশভেদে নানা জায়গায় নানা ধাঁচ দাঁড়িয়ে গেছে। মনের গড়ন, চেহারার ছাপ পড়েছে সেইসব জনগোষ্ঠীর , যাদের সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছে সেইসব এলাকার মানুষের রক্ত, তাদের চেহারা।

ভেড্ডিড ও দ্রাবিড়ঃ

বেদের মধ্যে আছে নিষাদদের বর্ণনা। মিশমিশে কালো রং, বেটে ধরনের গড়ন, ধ্যাবড়া নাক নিষাদদের। পণ্ডিতেরা মনে করেন এরাই বাংলাদেশের আদিবাসী। লম্বা মাথাওয়ালা আদি অস্ট্রেলীয় বা অষ্ট্রিকদের যে কথা বলা হয়েছে তাদেরকেই আর্যরা বলতো নিষাদ। বাঙালীর প্রায় সর্বস্তরে এদের রক্ত ছড়িয়ে আছে প্রচুর পরিমানে। মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসস্তুপের মাঝেও এ জাতীয় নরমুণ্ডের সন্ধান পাওয়া গেছে।

নৃ-তাত্ত্বিক পরিভাষায় বাঙালীর এই পূর্বপুরুষদের নাম হলো Dravido-Munda Longheads বা দ্রাবিড়মুন্ড দীর্ঘমুণ্ড জনধারা। সিংহলের ভেড্ডাদের সাথে চেহারার সাদৃশ্যের জন্য এদের ভেড্ডিডও বলা হয়ে থাকে। ভাষায় এরা ছিল অষ্ট্রিক ভাষী। এই অষ্ট্রিক বা ভেড্ডিডরা শুধু যে বাংলার অধিবাসী বা আমাদের পূর্বপুরুষ তা নয়, আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, মানসিক গড়ন সব কিছুতেই এদের প্রভাব খুব বেশি।

বাঙালীর রক্তে আর একটি উপাদান হলো দ্রাবিড়ভাষীদের। জনতত্ত্বের বিচারে দ্রাবিড় বা অষ্ট্রিকভাষীরা একই জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। দুইয়ের পূর্বপুরুষেরা এসেছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে, তবে একসাথে নয়। দ্রাবিড়ভাষীরা এসেছিল পরে। হয়তোবা তারা ছিল একই জনগোষ্ঠীর আর একটি শাখা। বাংলাদেশে এসে তারাও বাসা বেধেঁছিল। আমাদের ভাষা, আচার-আচরণে তার প্রমান আজো টিকে আছে।

মঙ্গোলীয় জনধারাঃ

বাংলাদেশের লোকজনের মাঝে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর প্রভাবও বেশ স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। বেশি করে চোখে পড়ে বাংলার উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণপূর্বাঞ্চলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মগ, চাকমা প্রভৃতির কথা বাদ

Dhaka University Institutional Repository

দিলেও উত্তর ও পূর্ব সীমান্তে তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমানদের মাঝে এই প্রভাব বেশ স্পষ্ট। উত্তর বাংলার রাজবংশী ও কোচদের চেহারাতো প্রায় খাঁটি মঙ্গোলীয় ধরনের।

চেপ্টা নাক, গালের উঁচু হাড়, গোফ দাড়ি, অপেক্ষাকৃত কম গোল বা মাঝারি মাথা, চোখের কোণে ভাঁজ সাধারনত এগুলোই হলো মঙ্গোলীয় চেহারার বৈশিষ্ট্য। মঙ্গোলীয়দের এই বৈশিষ্ট্য বাংলার প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। তবে কোথাও বেশি কোথাও কম। বিভিন্ন এলাকায় রক্তের সংমিশ্রণের ভিন্ন মাত্রার কারণেই এই তারতম্য। উত্তর বাংলার যাদের কথা বলা হলো তাদের মাঝে মঙ্গোলীয় রক্তের সাথে মিশ্রণের ভাগ অপেক্ষাকৃত কম। মগ, চাকমাদের মাঝে তা প্রায় নির্ভেজাল।

শংকর জাত বাঙালীঃ

প্রত্যেক জাতির মতো বাঙালীর চেহারারও নিজস্বতা আছে, বৈশিষ্ট্য আছে। অন্য দশটা দেশের লোকের ভিতর থেকে চিনে নিতে অসুবিধা হয়না। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, তবে সাধারণভাবে যাকে বলা হয় মাঝারি গোছের চেহারা অর্থাৎ মাথার গড়ন লম্বাও নয় আবার গোলও নয়, নাক অতিরিক্ত লম্বা বা একেবারে চেপ্টার মাঝামাঝি। উচ্চতায়ও মাঝারি ধরনের এই হলো খাঁটি বাঙালী আকৃতি, বাঙালী চেহারার বৈশিষ্ট্য।

যেসব উপাদান মিলে এই বৈশিষ্ট্য তাদের মাঝে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে আগত দ্রাবিড়মুণ্ড দীর্ঘমুণ্ড উপাদান বা ভেড্ডিড উপাদানই প্রধান। গোড়ায় গোটা দেশ জুড়ে এরাই ছড়িয়ে ছিল। পরে নানা অবস্থায় এরই সাথে মিশেছে কম বেশি পরিমাণে একই জনগোষ্ঠীর দ্রাবিড়ভাষী ধারা, অ্যালপীয় উপাদান, আর্যভাষী নর্ডিক ও গোল মাথা ওয়ালা মঙ্গোলীয় রক্তস্রোত। অঞ্চল ভেদে এই মিশ্রণের মাত্রায় কিছু পরিমাণে তারতম্য ঘটেছে ঠিকই– পশ্চিমাঞ্চলে দ্রাবিড়ভাষী মিশ্রণ ঘটেছে বেশি, পূর্বাঞ্চলে মঙ্গোলীয়দের, তবে বাঙালী জনপ্রকৃতি গঠনের ক্ষেত্রে এই তারতম্যের ভূমিকা খুবই নগন্য। ভেড্ডিড উপাদানের সাথে দ্রাবিড়, অ্যালপীয়, নর্ডিক ও মঙ্গোলীয় উপাদান মিলেমিশে কালক্রমে গোটা দেশ জুড়েই একই ধরন দাঁড়িয়ে গেছে, সৃষ্টি হয়েছে বাঙালী চেহারার বৈশিষ্ট্য, জন্ম নিয়েছে নূতন উপাদান বাঙালী।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালী হিন্দু সমাজ নানা বর্ণে বিভক্ত। একই বর্ণের ভিতরে নানা গোত্র, মূল ভাগের ভিতরে নানা উপভাগ। বর্ণ বা গোত্র সমূহ সৃষ্টির পেছনে কী যে কারণ এ নিয়ে নানা জনের নানা মত। অনেকে মনে করেন গোত্র আর সমাজের নিচের দিকে বিশেষত অন্ত্যজদের সাথে জাতের সৃষ্টির পেছনে লুকিয়ে আছে প্রাচীন কৌম সমাজের ছাপ। অনেকে এই মত অস্বীকার করেন। তার কারণ যাই হোক না কেন বর্ণভেদ প্রথা যে হিন্দু সমাজে পারস্পারিক মেলামেশার ক্ষেত্রে দূর্লঙ্ঘ্য বাধা তাতে কোনো সন্দেহ নাই। সামাজিক ও ধর্মীয় শিরোপা মাথায় নিয়ে এই বাধা স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। ফলে সমাজের সবটা মিলে একটা ক্যামিকেল কম্বিনেশন হয়ে উঠতে পারেনি। অনেক পরিমাণে মেকানিক্যাল মিক্সচার রয়ে গেছে। আর এ কারণে বর্ণভেদে জনপ্রকৃতি গঠনের উপাদান সমূহ মিশ্রণের মাত্রায়ও তারতম্য রয়ে গেছে কিছু কিছু।

তবু যদি এই বর্ণ বিভক্ত বাঙালী হিন্দু সমাজের অবয়ব বিশ্লেষণ করা যায় তাহলেও দেখা যাবে – বাঙালী জনপ্রকৃতির যে মূল বৈশিষ্ট্য একটু আগে উল্লেখ করা হলো তা এখানেও শুধু উপস্থিত নয়, অতিমাত্রায় উপস্থিত। মেকানিক্যাল মিক্সচার হওয়া সত্ত্বেও কোনো স্তরেই তার হেরফের হয়নি।

বিশিষ্ট সংখ্যাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ডঃ মহলানবিশ বাঙালী হিন্দু সমাজের সাতটি জাতের জনতাত্ত্বিক গঠন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। জাত সাতটি হলো ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত্য, রাজবংশী, পোদ ও বাগদি।

বাংলার বাইরের ব্রাহ্মণদের সাথে বাংলার ব্রাহ্মণদের যত না মিল তার চেয়ে অনেক মিল বাঙালী সমাজের অন্যান্য জাতির সাথে। বস্তুতপক্ষে বাঙালী ব্রাহ্মণ ও নমঃশুদ্রদের মাঝে নৃ-তাত্ত্বিক কোনো পার্থক্য নেই বললেই চলে। বাঙালী হিন্দুদের মাঝে একমাত্র ব্রাহ্মণদের সাথেই বাংলার বাইরের উচ্চবর্ণের সাথে কিছুটা সাদৃশ্য আছে। তবে সে সাদৃশ্য খুব বেশি দূর ব্যাপ্ত নয়।

আর একজন পণ্ডিত মিঃ চাকলাদার কলকাতার বেশ কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণ ও বীরভূমের মুচিদের জনতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়ে যে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন তাও মহলানবিশ মহাশয়ের অনুরূপ। তিনি দুয়ের মাঝেই অ্যালপীয় ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর উপাদান সমূহের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। আর এমনি ধারা প্রাণ সমূহের উপর ভিত্তি করেই পণ্ডিতেরা আরো সিদ্ধান্ত করেছেন যে , বর্ণভেদে বিভক্ত হিন্দু সমাজ

Dhaka University Institutional Repository

বা মুসলীম সমাজ নির্বিশেষে সব বাঙালীর জনতাত্ত্বিক লক্ষণসমূহ প্রায় এক। তাদের এই সিদ্ধান্ত থেকে এ কথাটা জোর করেই বলা চলে, বাঙালী তার নিজস্ব জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে ঐতিহাসিক কালের সূচনাতেই। তারপর নানা জাতের মানুষের সাথে বারবার মেলামেশা সত্ত্বেও এই বৈশিষ্ট্যের তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। আজ পর্যন্ত তা অপরিবর্তীত রয়ে গেছে [৬]।

৩.৪ আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাসস্থল:

বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্ত ও উত্তর সীমান্তের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে বিশেষ করে টেকনাফ থেকে শুরু করে শেরপুর পর্যন্ত একটি পর্বতমালা উঠে এসছে যার অংশ রয়েছে বাংলাদেশের সীমান্ত বরাবর মায়ানমারের (বর্মা) আকিয়াব এবং ভারতের মিজোরাম, ত্রিপুরা, আসাম ও মেঘালয় রাজ্য। এই সীমান্ত সংলগ্ন বাংলাদেশের জেলাগুলোতে রয়েছে ভিন্ন ভাষাভাষী, ভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের, নানা বর্ণের ও ধর্মের আদিবাসী জনগোষ্ঠী মানুষের বসবাস। এরমধ্যে কক্সবাজার জেলায় রাইন ও চাকদের বসবাস। বান্দরবান জেলায় তঞ্চঙ্গা, চাক, বম, খুমী, খীয়াং, পাঙ্গোয়া, লুসাইসহ ১২টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর বসবাস। রাঙামাটিতে, খাগড়াছড়ি ও কুমিল্লা জেলায় চাকমা, ত্রিপুরা, মারমা ও রাখাইনদের বসবাস। বৃহত্তর সিলেটে বসবাস করে হাজং ও খাসীয়ারা। বৃহত্তর ময়মনসিংহে গারো, হাজং, বানাই, কোচ, হাজু, হদি ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর বসবাস। এই সকল জনগোষ্ঠীরা সকলেই মঙ্গোলীয় নর-গোষ্ঠীর মানুষ[৭]।

এই অধ্যায়ের শুরুতে মানচিত্রে বিভিন্ন আদিবাসীর অবস্থান দেখানো হয়েছে [৮]।

৩.৫ বাংলাদেশের আদিবাসী সম্প্রদায়ের পরিচিতি:

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে বিভিন্ন আদিবাসী জাতিসত্তার বসবাস থাকলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে তা স্বীকৃত নয়। দেশের মোট জনসংখ্যার বিচারে আদিবাসী জনগোষ্ঠী খুব বেশি না হলেও তাদের মোট জনসংখ্যা খুব কম নয়। বাংলাদেশের আদিবাসীর শতকরা হার সরকারী হিসেব মতে এক শতাংশের কম, আদিবাসীদের হিসেব মতে দুই শতাংশের বেশি। তাদের জনসংখ্যা ২৫ লক্ষের উপরে যা পৃথিবীর অনেক দেশের মোট জনসংখ্যার চেয়ে বেশি। ঔপনিবেশিক শাসনামলে তাদের লড়াই করতে হয়েছে স্বাধীকার রক্ষার তাগিদে। ঔপনিবেশিক শাসনোত্তরকালে নব্য জাতি রাষ্ট্রের উত্থান আদিবাসীদের জন্য নূতন সমস্যা সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। কেননা এসব জাতিসত্তাগুলো বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন জাতি রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়েছে যা তাদের আত্ম পরিচিতির সংকটসহ বিভিন্ন সমস্যায় নিমজ্জিত করেছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাংশে পার্বত্য চট্টগ্রামে, উত্তরে বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও সিলেটে, উত্তর পশ্চিমে রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া এবং পাবনা জেলায় বেশির ভাগ আদিবাসীর বাস। সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসীর মধ্যে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাঁওতাল, উঁরাও, মুণ্ডা, মাহালী, মালো, মোলো, মাহাতো,পাহাড়ী, মালপাহাড়ী, গারো, বাসীয়া, মনিপুরি প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। তারা জাতীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে এবং অবদান রাখে। তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আমাদের সংস্কৃতিকে আরো সমৃদ্ধ করে। অথচ আমাদের আদিবাসীরা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক শোষণ বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার। বাংলাদেশের আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জীবনযাপন প্রনালী আজো হুমকীর সম্মুক্ষীণ। প্রতিনিয়ত তাদের অস্তিত্বের জন্য লড়াই করে টিকে থাকতে হচ্ছে। অতীতের ক্ষমতাসীন সরকার গুলোর নানা উন্নয়ন মূলক উদ্যোগ ও পরিকল্পনা তাদের জন্য পরিপূর্ণ সুফল বয়ে আনেনি। বিভিন্ন সময়ে আদিবাসীদের নিজ দেশ ছেড়ে জন্য দেশে চলে যেতে বাধ্য হতে হয়েছে [৯]।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের পরিচিতি:

পার্বত্য চট্টগ্রামে দশ ভাষাভাষীর ১৩ আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস। আদিবাসীগুলো হলো চাকমা (প্রকৃতপক্ষে চাঙমা), মারমা (মগ), ত্রিপুরা, মুরং (স্নো), ব্যোম (বনযোগী), খুমি, খ্যাং (খিয়াং), চাক, তঞ্চঙ্গ্যা (চাকমা জাতিগোষ্ঠীর প্রশাখা), লুসাই (কুকি), রিয়াং ও উসুই (ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠীর প্রশাখা) এবং পাংখো (পাংখোয়া)।

জাতিগোষ্ঠী:

নৃ-তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এরা সবাই মঙ্গোলয়েড। আকারে ছোট, মুখমণ্ডল গোলাকার, নাক চ্যাপ্টা, চুল কালো, চোখ ছোট ছোট, দাড়ি গোঁফ কম আর গালের হাড় উঁচু– এটা তাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য যা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর ন্যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম:

চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, মারমা ও চাকমা বৌদ্ধ, ত্রিপুরা ও খিয়াংরা হিন্দু। লুসাই, পাংখো ও ব্যোমরা খ্রিষ্টান। অবশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলো সর্বপ্রাণবাদী, প্রকৃতির উপাসনা অথবা সনাতন কোনো ধর্মের অনুসারী। তবে বর্তমানে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসমূহ খ্রিষ্টান মিশনারী ও এনজিও এর প্রভাবে খ্রিষ্টানধর্মে দীক্ষা লাভ করছে।

ভাষাঃ

ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের ইন্দো-এরিয়ান শাখার অন্তর্গত। মারমা, ত্রিপুরা, ব্যোম, ম্রো ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠী সমূহের ভাষা সিনো-টিবেটান পরিবারের টিবেটো-বার্মেন বা ভোট-বর্মী শাখার অন্তর্গত। লুসাই, পাংখোদের ভাষা মধ্য কুকি চীনা এবং খুমি ও খিয়াংদের ভাষা বর্মি, আরাকানি বোরো, নাগা ও কুকি চীনা ভাষারই মিশ্ররূপ। তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলে তাদের নিজেদের ভাষায়। তবে ভিন্ন গোষ্ঠীদের সাথে কথা বলে বাংলায়। তারা রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা 'বাংলা' কে ব্যবহার করে।

সংস্কৃতিঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জাতিগোষ্ঠীগুলোর প্রত্যেকটি তাদের নিজস্ব জীবনধারা, সামাজিক আচার, রীতি-নীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভাস তথা সকল উৎসবাদির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়া স্বাতন্ত্র রয়েছে। সাধারণ ভাবে ধর্মপ্রাণ হলেও পাহাড়ীদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি নেই। বাংলা বছরের শেষে চাকমা ও মারমারা 'মহামনি মেলা' নামে বার্ষিক উৎসব পালন করে। এছাড়া রয়েছে 'বৈশাখী' উৎসব।

জুমচাষ তাদের জীবিকার প্রধান মাধ্যম। নারী পুরুষ সকলেই একত্রে জুমচাষ করে। যেহেতু এক পাহাড়ে বেশি দিন জুমচাষ চলেনা সেহেতু পাহাড়ীদের একটা বিরাট অংশ যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ায় এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে। আর এ কারণেই জমির উপর তাদের স্থায়ী স্বত্ব গড়ে ওঠেনা। নৃত্যগীত, কাপড় বোনা, কারুশিল্প এদের জীবন-জীবিকার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

Dhaka University Institutional Repository

সহজ-সারল্য জীবনধারা প্রত্যেকটি পাহাড়ী জাতিগোষ্ঠীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এদের বিচারপদ্ধতিও অনেকাংশে ভিন্ন ভিন্ন। বস্তুত পাহাড়ীদের প্রাক-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও জীবন পদ্ধতি তাদেরকে আধুনিক বিশ্ব সভ্যতার ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার হার বৃদ্ধির কারণে বিশেষ করে চাকমারা ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্য দিয়েই নিজস্ব স্বাতন্ত্রমণ্ডিত জীবনধরা গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৩.৬ আদিবাসীদের বাংলাদেশে আসার ইতিহাস:

আরাকান বর্তমানে মায়ানমার প্রজাতন্ত্রের একটি প্রাদেশীক রাজ্য হলেও অতীতে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ছিল। ১৭৮৪ সালে বর্মী রাজা বোদাপায়া আরাকান রাজা থামাদাকে পরাজিত করে স্বাধীন আরাকান ভূমি দখল করে নেয়। সেই সময় বিপুল সংখ্যক আরাকানী শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশে প্রবেশ করে স্থায়ী অধিবাসী হয়ে যায়। আরাকানী আদিবাসীরা বাংলাদেশে নিজেদের আরাকানী না বলে রাখাইন পরিচয় দিয়ে থাকে [১০]। ১৭৮৫ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত আরাকানী শরণার্থীদের চট্টগ্রামে আগমন অব্যাহত ছিল। ব্রহ্মরাজের আরাকান বিজয়ের ১৬ বছর পর ১৮০১ সালে রামুর আরাকানী শিবিরে লক্ষাধীক আরাকানী ছিল। ইংরেজ সরকার আরাকানীদের ফিরে যেতে বললে আরাকানীরা ফিরে যেতে অস্বীকার করে। তখন ইংরেজ সরকার আরাকানীদের পার্বত্য চট্টগ্রামের মোমাং সার্কেল তৎকালীন কক্সবাজার ও পটুয়াখালীতে পুণর্বাসন করেন। কিন্তু কক্সবাজার মহকুমায় বসতি স্থাপনকারী আরাকানী শরণার্থীদের একটা বৃহৎ অংশ কক্সবাজার ত্যাগ করে সীতাকুণ্ডে বসতী স্থাপন করে। কিন্তু সেখানেও তারা স্থায়ী হয়নি। অবশেষে তারা উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে মং সার্কেলে গিয়ে বসতি স্থাপন করে, তারাই হলো মারমা জাতিগোষ্ঠী [১১]।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকাঃ

১। সুপ্রিয় তালুকদার, চাকমা সংস্কৃতির আদিরূপঃ রাঙামাটি ১৯৮৭ ঢাকা, পৃষ্ঠাঃ ১৬-১৭

২। Captain T.H Lewis, The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers there in 1869.p-28

৩। মেসবাহ কামাল
আরিফাতুল কিবরিয়াঃ বিপন্ন ভূমিজ, অস্তিত্বের সংকটে আদিবাসী সমাজ
বাংলাদেশ ও পূর্বভারতের প্রতিচ্ছবি, গবেষক ও উন্নয়ন কালেকটিভ(আর ডি সি), পৃঃ৭৯-৮২

৪। শিশু বিশ্বকোষ, পৃষ্ঠাঃ ১০০-১০৩

৫। খন্দকার মাহমুদুল হাসান, হারানো পৃথিবীর আশ্চর্য কাহিনী,পৃষ্ঠাঃ৮৬-৮৭

৬। অজয় রায়, বাঙলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ১৩-২৩

৭। মুস্তাফা মজিদ, হাজং জাতিসত্তা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃষ্ঠাঃ ৭-৮

৮। পরিবেশ পরিচিতি, পঞ্চম শ্রেণী (বোর্ডের বই), পৃষ্ঠাঃ ১৪২

৯। মেসবাহ কামাল
আরিফাতুল কিবরিয়াঃ বিপন্ন ভূমিজ, অস্তিত্বের সংকটে আদিবাসী সমাজ
বাংলাদেশ ও পূর্বভারতের প্রতিচ্ছবি, গবেষক ও উন্নয়ন কালেকটিভ(আর ডি সি), পৃঃ ১৬

১০। মোস্তাফা মজিদ, আদিবাসী রাখাইন,পৃষ্ঠাঃ ৯

১১। মোস্তফা মজিদ, মারমা জাতিসত্তা, পৃষ্ঠাঃ ২৭-২৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয় সংহতি

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংহতি:

৪.১ জাতীয় সংহতির সংজ্ঞা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত জাতীয় সংহতিরও একক কোনো সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। কারণ এক এক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ এক এক দৃষ্টিকোণ থেকে এক ব্যাখ্যা করেছেন। এসব ব্যাখ্যা জাতীয় সংহতির একক বা সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা চিহ্নিত করেনা, কেবল একটি ধারণার জন্ম দেয় মাত্র। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, যে নীতি একটি রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্ন ও বিখণ্ড সব চিন্তাভাবনা একীভূত করে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি অবলম্বন ও সমর্থন করে এবং সাধারণ জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায়, তাকে জাতীয় সংহতি বলা হয়। এই নীতির সাহায্যে একটি সমগ্র জাতিকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ করে রাখা যায়। জাতীয় সংহতি গড়ে উঠার পর জাতীয় আনুগত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একে রক্ষা করা হয়।

Myron Weiner এর মতে ,"বিখণ্ড সব চিন্তাধারাকে উচ্ছেদ করে জাতীয় ভিত্তিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করাকেই জাতীয় সংহতি বলা হয় ।" [১]

অনেকের মতে, একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের আওতায় থাকা সরকারের প্রতি সকল নাগরিকের আনুগত্য প্রদর্শন এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও প্রক্রিয়ার এক প্রকার সুশৃংখল বন্ধনকে জাতীয় সংহতি বলা হয়।

" In the current literature the term nation building is, most often used inter changeable with national integration. " [২] Rounaq Jahan

Oxford English Dictionary তে সংহতির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে," To integrated is to put or bring together (parts or elements) so as to form one whole ; to combine in a whole."[৩]

জাতি গঠন হলো একটি দেশে সুপরিকল্পিত উপায়ে একাধীক রাজনৈতিক সম্প্রদায় গঠন করা, তবে রাষ্ট্রই হবে প্রভাবশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান [৪]।

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জাতি গঠন হচ্ছে অন্যতম জটিল সমস্যা, কেননা অধিকাংশই এখনো জাতিতে পরিণত হতে পারেনি যদিও তারা জাতি গঠন সম্পর্কে আশান্বিত [৫]। জাতি গঠন অত্যন্ত কঠিন কাজ। এর শুরু আছে নেই কোনো সমাপ্তি। এটি ক্রমবর্ধমান ধারায় পরিপূর্ণতা অর্জন করে। তাছাড়া জাতি গঠন হচ্ছে একটি বহুমাত্রিক সমস্যা [৬]। জাতি গঠন বলতে অনেক সময় জাতীয় সংহতি বোঝায়।

জাতীয় সংহতি আধুনিকীকরণের একটি দিক মাত্র। জাতীয় সংহতি একটি সমাজের বিভিন্ন উপাদান গুলোকে একটি অধিকতর সামগ্রীকতায় সংহত করে, অথবা বহুধরনের ক্ষুদ্র ও বিভিন্নমুখী সমাজকে এক জাতির বন্ধনে আবদ্ধ করে।

Amitai Elzioni সংহতির সংজ্ঞায় বলেছেন, জাতীয় সংহতি হচ্ছে, " অভ্যন্তরীন ও বাইরের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার একটি ইউনিট বা ব্যবস্থার সক্ষমতা "[৭]।

এই সংজ্ঞা অনুসারে সংহতি হচ্ছে পৃথক পৃথক অংশগুলোকে একত্রিত করা। পৃথক অংশগুলোকে আত্মব্যবস্থাগত ও যথোপযুক্ত ক্ষমতাসহ একটি সম্প্রীতিপূর্ণ স্বাধীন সভায় একত্রিত করা।

৪.২ বাংলাদেশে কি জাতীয় সংহতি আছে:

একটি অপেক্ষাকৃত নূতন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশে যে জাতীয় সংহতি থাকার কথা ছিল তা নেই। স্বাধীনতার পর নাগরিকদের বিভিন্ন মত, সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধে আবদ্ধ হওয়া, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অপরিণামদর্শী পদক্ষেপ এবং সুশিক্ষিত সমাজের ৭১ অভাবে সালের পূর্বে গঠিত হওয়া জাতীয় সংহতি বিনিষ্ট হয়ে যায়। জাতীয় সংহতির বৈশিষ্ট্য গুলোর আলোকে বলা হয় বাংলাদেশে বর্তমানে জাতীয় সংহতির অভাব রয়েছে।

তৃতীয় বা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জাতীয় সংহতি একটি বড় সমস্যা। অধ্যাপক মাইরন উইনারের মতে, "জাতীয় ঐক্য বজায় রাখাই সম্ভবত দক্ষিণ ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহের সর্বাপেক্ষা কঠিন রাজনৈতিক সমস্যা"। অনেকে মনে করেন, কোনো উন্নয়নশীল দেশেই সত্যিকার অর্থে জাতীয় সংহতি রক্ষা করা

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া, আফ্রিকার স্বাধনিতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর জাতীয় সংহতি সম্পর্কে রুপার্ট এমারসন বলেন, " এ দেশগুলো প্রথমে স্বাধীনতা অর্জনের নিমিত্তে নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুললেও, এরা মনে মনে জাতীয়তাবাদী হলেও আসলে এরা মোটেও একটি জাতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারেনা"[৭]। উপর্যুক্ত ধারণা অনুযায়ী বাংলাদেশকেও একটি জাতীয় সংহতি সম্পর্কিত সমস্যাপূর্ণ দেশ বলা যায়।

৪.৩ বাংলাদেশে জাতীয় সংহতি না থাকার কারণ গুলো নিম্নরূপ:

১) স্বার্থ একত্রিকরণে উদ্যোগের অভাব:

যেকোনো দেশে জাতীয় সংহতির সঙ্গে স্বার্থ একত্রিকরণের একটা যোগসূত্র আছে। প্রতিটি জনগোষ্ঠী বা নাগরিকের স্বার্থ এক হলে জাতীয় সংহতি দৃঢ় হয়। ৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বা ৯০ সালের স্বৈরাচার পতন আন্দোলনে বাংলাদেশের প্রায় সকল নাগরিকের স্বার্থ একত্রিকরণ হয়েছিল। সে সময় তাই জাতীয় সংহতির মাত্রা ছিল খুব বেশি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এটা ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার পর পরই নিজ নিজ স্বার্থের দিকে বেশি করে নজর দেওয়ায় এ সমস্যা দেখা দেয়। অন্যদিকে কোনো সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে সবার স্বার্থ একত্রিকরণের কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি যে কারণে এই অভাববোধ থেকে বাংলাদেশের জাতীয় সংহতির অভাব দিন দিন তীব্র হচ্ছে।

২) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলোর সমন্বয় সাধনে অপারগতা:

জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠগুলোর গুরুত্ব সবার আগে চলে আসে। কিন্তু বাংলাদেশে এটি বারবারই উপেক্ষিত হয়েছে। রাষ্ট্রের মাধ্যে বসবাস করেও প্রান্তিক বা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী যখন শাসক গোষ্ঠী দ্বারা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়, তাদের নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ইত্যাদি যখন উপেক্ষিত হয়, আবেগ অনুভূতি আচরণ, চিন্তা বিলুপ্ত করার চেষ্টা চলে তখন জাতীয় সংহতিও ব্যহত হয়। অন্যদিকে বলা যায় জাতীয় সংহতি বিনিষ্ট হবার কারণে এই গোষ্ঠীগুলো একই ভৌগোলিক সীমানায় অবস্থান করলেও রাষ্ট্র থেকে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩) অনুপ্রবেশ সংকট:

জাতীয় সংহতি স্থাপন না হওয়া বা বিদ্যমান জাতীয় সংহতি বিনিষ্ট করার একটি মূল উপাদান হলো এই অনুপ্রবেশ সংকট। সরকার এবং জনগণের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকলে কিংবা কাঠামোগত কোনো শূন্যতা বিরাজ করলে সরকার ক্রমেই জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সরকার প্রচলিত মূল্যবোধ বা কাঠামো ভেঙ্গে জনগণের অনুপযোগী কাঠামো চাপিয়ে দিতে চাইলেও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়। ফলে স্বাভাবিক ভাবে জাতীয় সংহতিও বিনিষ্ট হয়।

৪) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অভাব:

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল চরিত্র হারিয়ে ফেললে কিংবা বৈশিষ্ট্য পরিবর্তীত হলে জাতীয় সংহতি বিনিষ্ট হয়। সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও এখানে গণতন্ত্রের নিয়মকানুন প্রতিনিয়ত ব্যহত হচ্ছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সম্মান না দেখানো, ধর্মকে জাতীয় ঐক্য বা সংহতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা এর অন্যতম কারণ।

৫) বৈধতার সংকট:

মূলত সামরিক সরকারই এই সংকটে ভোগে। বাংলাদেশে বেশ কবার সামরিক শাসন জারি হওয়ায় সরকার গুলো যে বৈধতার সংকটে ছিল তা সে সময় জাতীয় সংহতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। অনেক সময় নির্বাচিত সরকারও বৈধতার সংকটে ভুগতে পারে। ভোটে কারচুপি অথবা অবৈধ ভোট প্রদানের মাধ্যমে কোনো সরকার জয়ী হলেও সে সরকারকে বৈধতার সংকটে ভুগতে হয়। যেমন; ২৯ নভেম্বর ২০০৮ সালের নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি জেলার একটি আসনে 'না' ভোট বেশি পড়েছিল। ভোটের এই নিয়ম তত্ত্বাবধায়ক সরকার চালু না করলে হয়তো ঐ ভোটগুলো নষ্ট হতো নতুবা অবৈধভাবে ব্যবহৃত হতো।ফলে ঐ অঞ্চলের জনপ্রতিনিধিকে পরবর্তী সময়ে বৈধতার সংকটে পড়তে হতো। বিশেষ করে বিভিন্ন উপনির্বাচনে যখন ক্ষমতাসীন সরকার কৌশলে ও ক্ষমতার জোরে নিজেকে আরো শক্তিশালী করার জন্য ঐসব আসনে জয় নিশ্চিত করে তখন সেই প্রতিনিধীসহ ক্ষমতাসীন সরকারকেও বৈধতার

Dhaka University Institutional Repository

সংকটে পড়তে হয়। যেমন এবারে ভোলার উপনির্বাচনে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের সমর্থিত প্রার্থীর জয় লাভের বিষয়টি নিয়ে বৈধতার প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীদল এবং জনমনেও প্রশ্ন জেগেছে।

৬) অংশগ্রহনের সংকট:

রাজনীতিতে, বিশেষ করে সরকার গঠনে কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর অংশগ্রহনের সংকট দেখা দিলে তা জাতীয় সংহতির জন্য হুমকী হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ও শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহনের সংকট রয়েছে। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের দূর্গম পাহাড়ী এলাকার জনগণ এখনও অনেক পিছিয়ে। শহরের সাথে এখনও অনেক এলাকার জনগণের যোগাযোগ নেই বললেই চলে। তাই শাসন পরিচালনায়ও তাদের কোনো অংশগ্রহণ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা:

১। অনাদী কুমার মহাপাত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচিতি, পৃষ্ঠা: ৩১৩

২। Rounaq Jahan, Pakistan: Failure in national integration, Oxford University Press Bangladesh Edition, 1973, P-3

3. The Oxford English Dictionary, VOI. V, H-K, London, Oxford University Press, 1933, P-367

৪। তপন কুমার দেবনাথ, গবেষণা প্রবন্ধ: বাংলাদেশে জাতি গঠনের সমস্যা: পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা: ৮

৫। অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা: ৫

৬। Amitai Etzioni, Political Unification: A Comparative Study of Leaders and Forcess, New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc 1965, P-330

৭। Rupert Emerson, From Impire to Nation, Boston, Beacon Press, 1960,P-94

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা কি জাতি গঠন সমস্যা

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

৫.১ বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা কি জাতি গঠন সমস্যা:

স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ যেসব সমস্যার আবর্তে ঘুরছে তার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা অন্যতম। পশ্চিম পাকিস্তানের অব্যাহত শোষণ নিপীড়ন বঞ্চনার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা পাহাড়ী বাঙালী ঐক্য প্রক্রিয়া স্বাধীনতা যুদ্ধে অটুট থাকলেও পরবর্তী সময়ে তা বিনিষ্ট হতে থাকে। স্বাধীনতার পর চার মূলনীতিকে ভিত্তি করে পাহাড়ী বাঙালীর মধ্যে যে ঐক্য হবার কথা ছিল তা প্রথম বিনিষ্ট হয় বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের একটি উক্তিকে কেন্দ্র করে। তিনি সবাইকে বাঙালী হয়ে যাওয়ার যে আহবান জানিয়েছিলেন তা পাহাড়ী অর্থাৎ ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো মেনে নিতে পারেনি।

এরপর জিয়াউর রহমানের আমলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করে। কারণ শেখ মুজিবর রহমানের সময় পাহাড়ীরা Ethnic Minority থাকলেও অন্য কোনো সমস্যা সেখানে ছিলনা। কিন্তু জিয়াউর রহমান বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করায় এবং এর সাথে ইসলাম ধর্মকে যুক্ত করায় পাহাড়ীরা Religious Minority-ও হয়ে যায়। এরশাদ সরকারের আমলে ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম করার কারণে সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। সমস্যা এত ব্যাপক হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা এক সময় জাতিগত সমস্যা হিসেবেই চিহ্নিত হয়। নিম্নক্তো ব্যাখ্যাগুলো এই ধারণাকেই সমর্থন করে।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি সমর্থন:

যেকোনো জাতির ক্ষেত্রে সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ হচ্ছে সে দেশে বাস করার প্রধান শর্ত। জাতি গঠনের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে এ ধরনের আনুগত্য লক্ষ্য করা যায় না। বিপরীতে এ এলাকার বাসিন্দারা প্রথমে প্রাদেশীক স্বায়ত্বশাসন ও পরে আঞ্চলিক স্বয়ত্বশাসন দাবি করে যা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি হুমকী হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে বাংলাদেশে যে তিন স্তর বিশিষ্ট সরকার ব্যবস্থা আছে প্রাদেশীক বা আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন তার কোনোটির মধ্যেই পড়েনা। সুতরাং এ বৈশিষ্ট্যকে রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি ধরে বলা যায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা জাতি গঠন সমস্যা।

Dhaka University Institutional Repository

বঞ্চিত মনোভাব:

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন সময়ে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপে সেখানকার বাসিন্দারা যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। তারা নিজেদের বঞ্চিত জনগোষ্ঠী হিসেবে মনে করে। তারা মনে করে বাঙালীদের পাহাড়ী এলাকায় পূণর্বাসন করা সরকারের সঠিক সিদ্ধান্ত হয়নি। তারা আরো মনে করে যে শুধু তারাই হবে ঐ এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা, বাঙালীরা নয়। বিগত সরকারের আমলে ঐ অঞ্চলে যেসব বাঙালীদের পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাদেরকে সরকার এখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে আসছে। এতে করে ঐ অঞ্চলের বাঙালীদের অবস্থা পাহাড়ীদের তুলনায় দিনে দিনে অনেক উন্নত হচ্ছে। পাহাড়ীদের এই মনোভাব তাদেরকে বিদ্রোহী হিসেবে গড়ে তুলেছে।

সরকারকে সবসময় সারা দেশের নাগরিকের জন্য একই নীতি গ্রহণ করা উচিত। সমভূমিতে এসে কোনো পাহাড়ী যদি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চায় তাহলে কোনো বাঙালী তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেনা কিংবা তাদের প্রশাসনের কাছ থেকেও অনুমতি গ্রহনের প্রয়োজন হয়না। তারা যে স্বাধীনতা সমভূমিতে পাচ্ছে সেই একই স্বাধীনতা কোনো বাঙালী পার্বত্য অঞ্চলে পাচ্ছেনা। তাদের এই অসহযোগিতামূলক আচরণ এবং নেতিবাচক মনোভাবের কারণে আমাদের জাতীয় সংহতি বিনিষ্ট হচ্ছে।

৫.২ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিচ্ছিন্ন কোনো অঞ্চল নয়:

বিশ্বে ১,৪৭,৫৭০ বর্গমাইল আয়তনের ছোট্ট একটি দেশ বাংলাদেশ। এখানে রয়েছে সাতটি বিভাগ, চৌষট্টিটি জেলা। এই চৌষট্টটি জেলার মধ্যে তিনটি জেলা নিয়ে গড়ে উঠেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম।বাংলাদেশী নাগরিক হিসেবে এখানে রয়েছে সবার সমান অধিকার। জাতীয় সংসদের ৩০০ নং আসন বান্দরবানের একজন নাগরিকের যেমন অধিকার রয়েছে বাংলাদেশের যেকোনো অঞ্চলে বসবাস করার তেমনি অধিকার রয়েছে ১ নং আসন পঞ্চগড়ের একজন নাগরিকের যেকোনো অঞ্চলে বসবাস করার, জমি জায়গা ক্রয় করার, ব্যাবসা বানিজ্য করার। ক্ষুদ্র আয়তনের ছোট্ট এই দেশটিতে রয়েছে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, গোষ্ঠীর মানুষের বসবাস। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ভিন্ন হলেও আমাদের বড় পরিচয় আমরা বাংলাদেশের নাগরিক।

Dhaka University Institutional Repository

রেকর্ডেড ইতিহাস এই যে, মাত্র ১৮৬০ সালের ২৬ জুনের নোটিফিকেশন নম্বর ৩৩০২ এর ভিত্তিতে এবং একই সালের ১লা অগাষ্টের " রেইস্‌ড অফ ফন্টিয়ার এ্যাক্ট ২২ অফ ১৮৬০ " অনুসারে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী তাগিদে চট্টগ্রামের পাহাড় প্রধান অঞ্চলকে স্বতন্ত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার রূপ দেওয়া হয়। এরপর ১৯০০ সালের ১লা মে নোটিফিকেশন ১২৩ পিডি হিল ট্রাক্টস রেগুলেশন জারি করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন এলাকায় পরিণত করে অযৌক্তিকভাবে সেখানে এদেশের মূল জনগণ তথা বাংলাভাষী বা বাঙালীর অবাধ গমনাগমণ ও বসতি স্থাপনকে বিঘ্নিত করে ভূমিজ সন্তান (Son Of The Soil) নয়, এমন বহিরাগত ও বিদেশী এবং এদেশে অভিবাসী আরাকানী, লুসাই, টিপরা জাতিগোষ্ঠীর ঠাঁই করে দেওয়া হয়।

১৯৮৯ সালে এ প্রক্রিয়ায় আরও মারাত্মক ইন্ধন যোগানো হয় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিল, এ্যাক্ট ইত্যাদি বাংলাদেশ গেজেটে, মার্চ ২, ১৯৮৯। অথচ আজ চাকমারা বহিরাগত হয়েও সম্পূর্ণ মিথ্যাচার করে নিজেদের পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিজ পুত্র এবং বাস্তবে যারা এদেশবাসী সেই বাঙালীদের বহিরাগত বলে ভারতীয় প্রভাবে এবং বিভিন্ন চক্রের সহযোগিতায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন এবং স্বাধীন করে "জুমল্যান্ড " করার দাবি উঠিয়েছে।

এই জুম শব্দটি চাকমাদের নিজস্ব শব্দ নয়। এটি এসেছে কোলদের শব্দ থেকে। এছাড়া জুম চাষ এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে শতকরা ১০ ভাগেরও কম হয়। আবার চাকমারা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১ ভাগের অর্ধেকেরও কম, তথা কেবল দশমিক ২২ শতাংশ। তারা আরো ক্ষুদ্র ১২ জাতির নাম ভাঙ্গিয়ে বাস্তবে তাদের প্রতারিত করে বাংলাদেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী ও ভূকৌশল গত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক-দশমাংশ ভূখণ্ডে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামটি পর্যন্ত চিরতরে মুছে দিয়ে " জুমল্যাণ্ড " এবং প্রকৃত প্রস্তাবে " চাকমাল্যাণ্ড " বানাতে চায় দেশীয় ষড়যন্ত্রকারী ও প্রভু রাষ্ট্রের সহযোগিতায় ।

এ বিষয়ে ইতিহাসবিদরা যা বলেন–

সতীশ ঘোষ চাকমাদের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে একথা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, চাকমাদের আদী নিবাস পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, তারা বাইরে থেকে এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সতীশ ঘোসের শিষ্য বিরাজ মোহন দেওয়ান 'চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত' (রাঙামাটিঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম) গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "চাকমাদের পূর্বপুরুষরা যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিজ সন্তান নহে তাহা স্পষ্ট " পৃষ্ঠা–৯৪।

সাংবাদিক জয়নুল আবেদীন ' পার্বত্য চট্টগ্রাম: স্বরূপ সন্ধানে' (ঢাকা:১৯৯৭) এ বিষয়ে বিষদ আলোচনা করেছেন। কোনো কোনো চাকমা ইতিহাসবিদ নিজেদের আদী দেশ হিসেবে চম্পাপুরী বা চম্পকনগর নামে যে রাজ্যের বর্ণনা তাদের লেখায় প্রদান করেন, সেটিও প্রমানবিহীন বা বাস্তবতাবর্জিত। কেননা ভারতে ও এর বাইরে অন্তত পাঁচটি স্থানের নাম আছে চম্পাপুরী বা চম্পকনগর নামে। এগুলো উত্তর বার্মা তথা শান, প্রাচীন মগধ অর্থাৎ আজকের বিহার, কালবাঘা অর্থাৎ আজকের আসাম, প্রাচীন মালাক্কা তথা আজকের মালয়, কৌচীন ও হিমালয়ের নিচে সাংগুপু নদীর তীরে অর্থাৎ আজকের দিনের ব্রহ্মপুত্রের তীরে।কিন্তু এগুলোর কোনোটিতেই চাকমাদের আদী অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। আসলে চম্পা বা চম্পক এসব শব্দের সাথে চাকমা শব্দের খানিকটা মিল থাকায় চাকমারা কল্পনা মিশিয়ে আবিষ্কার করতে চান যে চম্পা বা চম্পক তাদের আদী বাসস্থান।

" বর্তমানে ভারতে এবং ভারতের বাইরে বহু চম্পাপুরী বা চম্পকনগরের নাম পাওয়া যায়। এইজন্য এই নামটি নিয়ে বিভ্রান্ত থাকা স্বাভাবিক।" বলেছেন অশোক কুমার দেওয়ান (চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার; বাগড়াছড়ি ১৯৯১ , পৃষ্ঠা –৩৫)।

চাকমা লোকগাঁথা কী বলেঃ

চাকমাদের মধ্যে বহুল প্রচলিত দুটি পক্তি আছে–

" আজি রাজা শের মস্ত খাঁ, রোয়াং ছিল বাড়ি
তারপর সুখদেব রায় বান্ধে জমিদারী"

এ থেকেই বোঝা যায় চাকমাদের আদী নিবাস ছিল উত্তর আরাকানের রোসাং এ।

Dhaka University Institutional Repository

চাকমাদের অতি পরিচিত লোকগীতি হচ্ছে–

" ঘরত গেলে মগে খায়
ঝারত গেলে বাঘে খায়
বাঘে ন গেলে মগে খায়
মগে ন গেলে বাঘে খায় "

এই লোকগীতি থেকে মনে হয় চাকমারা আরাকানের মগধ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর অস্তিত্ব রক্ষার্থে পার্বত্যাঞ্চলে তথা আজকের পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় নেয়।

ঐতিহাসিক ডঃ আবদুল করিমও একমত পোষণ করে বলেছেন যে, প্রাচীন মানচিত্রে পর্তুগীজের অধিবাসী জোয়ান ডি ব্যারোজ চাকোমাস নামের এক অঞ্চল নির্দেশ করেছেন, যা রাইক্ষ্যাং ও সুবলং ইপ-নদীদ্বয়ের উৎস অঞ্চলের পূর্বদিকে চীন পাহাড় অঞ্চলে অবস্থিত। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, উত্তর আরাকানে চাকমাদের আদী নিবাস ছিল[১]।

৫.৩ বিভিন্ন শাসনামলে আদিবাসীদের অবস্থানঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে আদি সভ্যতার কোনো নিদর্শন নাই। মানব বসতির ইতিহাস যেহেতু খুব একটা দীর্ঘ নয় সেহেতু জুম্ম জাতীয়তাবাদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাও খুব বেশি দিনের নয়। ত্রিপুরা রাজবংশ, আরাকান রাজবংশ, সুলতানী শাসনামল, শেরশাহ্ ও মোঘল আমল, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল। এরপর বৃটিশ আমল, পাকিস্তানী আমল প্রভৃতি শাসনামল পেরিয়ে বর্তমানে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ আমল।এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় দেখা যায় জুম্ম জাতীয়তাবাদের চেতনা ; যার উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামরে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি সুন্দর পার্বত্য চট্টগ্রাম আজ আমাদের মাঝে প্রবাহমান। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো আলোচনা করতে গেলে সঙ্গত কারণেই উৎসের দিকে আমাদের তাকাতে হবে। তাই এই অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সুদূর অতীতে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল নিয়ে ত্রিপুরা রাজ ও আরাকান রাজের মধ্যে অঞ্চলটি বহুবার হাত বদল হয়। দখল পাল্টা দখলে দেখা যায় ৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জুযারুপা (বীর রাজা) আরাকান রাজাকে পরাজিত করে উক্ত অঞ্চলটি দখল করে নেন এবং রাঙামাটিতে রাজধানী স্থাপন করে দীর্ঘ সাড়ে তিনশ বছর অঞ্চলটি শাসন করেন। ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাজা পুনরায় অঞ্চলটি দখল করার পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় পৌনে তিনশ বছর অঞ্চলটিতে আরাকান রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠীত থাকে।

সুলতানী আমলে সুলতান ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ্ (১৩৩৮–১৩৪৯) চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু অংশ জয় করেন। এ সময় চাকমা রাজা মোয়াম শ্রী বার্মা হতে বিতাড়িত হয়ে আলী কদমে একজন মুসলীম রাজ কর্মচারীর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় চাকমারা রামু ও টেকনাফে বসতি স্থাপনের অনুমতি পায়। ১৪০৬ সালে আরাকান রাজ মং সোমওয়ানকে বিতাড়িত করে সুয়ামংঝি সিংহাসন দখল করেন। বিতাড়িত রাজা গৌড়ের সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহের নিকট সাহায্য কামনা করেন এবং সুলতানের সাহায্যে পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠীত হন।

মং সোমওয়ানের উত্তরসূরী মং খারী (১৪৩৪–৩৯) সিংহাসনে অধিষ্ঠীত হয়ে রামু ও টেকনাফ হতে চাকমাদের বিতাড়িত করেন এবং আংশিক সফলতাও লাভ করেন। অবশ্য সুলতান ইলিয়াস শাহ (১৪৫৯-৭৪) তাঁর শাসনামলের শেষ দিকে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনরায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে সম্রাট আলাউদ্দীন হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) রাজত্বকালে আরাকান সম্রাট নুসরাত খানের নেতৃত্ব এই অঞ্চলে স্বল্প সময়ের জন্য সুলতানী আমলের অবসান ঘটে। অবশ্য ত্রিপুরা রাজা ধন্য মানিক্য ১৫১৫ সালে চট্টগ্রাম অঞ্চল এবং আরাকানের কিছু অংশে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার কিছু অংশ ১৫১৮ সালে মগরাজা মিনইয়াজা কর্তৃক বেদখল হয়ে যায়। এভাবে চলতে থাকা দখল পাল্টা দখলের খেলায় শেষ পর্যন্ত আরাকান রাজা মং ফালাউন ওরফে সিকান্দর শাহ (১৫৭১-১৫৯৩) ই বিজয়ী হন এবং সমগ্র চট্টগ্রাম অঞ্চল ,নোয়াখালীর বেশীরভাগ এবং ত্রিপুরার কিছু অংশ জয় করেন [২]।

শেরশাহের আমলে ঈশ্বরের রাজত্ব (Land Of Good) নামে খ্যাত পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী চাকমা, মারমা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের সহযোগিতায় পর্তুগীজ নাবিকরা এখানে বসবাস শুরু করে

Dhaka University Institutional Repository

। এই সময় এরা সমতলে দস্যুবৃত্তি শুরু করে এবং আরাকান রাজের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে। এই সুযোগে তৎকালীন মোঘল প্রশাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে তৎকালীন অর্থাৎ ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের নির্দেশানুসারে সুবেদার শায়েস্তা খান সমগ্র চট্টগ্রাম দখল করেন এবং এই অঞ্চলের নাম দেন ইসলামাবাদ। ১৭৬০ সালের ১৫ অক্টোবর বাংলার নবাব মির কাশিম পার্বত্য চট্টগ্রামসহ পুরো চট্টগ্রামের শাসনভার বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে তুলে দেন। এ কথা সত্য যে, মোগল বা ইংরেজ শাসন পাহাড়ীরা বিনা প্রতিরোধে মেনে নেয়নি। ফলে, এ অঞ্চলে ইংরেজরা শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রিত জেলা হিসেবে ঘোষণা দিতে বাধ্য হয় এবং সেখানে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়। প্রশাসনিক কর্তৃত্ব থাকে হেডম্যানদের হাতে। ইংরেজ প্রতিনিধিগণের শুধুমাত্র কর আদায়ের মধ্যে কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ থাকে।

"১৭৮৭ সালের ২৪ জুন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চট্টগ্রাম প্রতিনিধির কাছে লিখিত আরাকান রাজের পত্র হতে ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। রাজা তার পত্রে আরাকান থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পালিয়ে আসা কিছু গোত্রের নাম উল্লেখ করেন যারা পাহাড়ী অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে উভয় দেশে লুটপাট চালাচ্ছিল। রাজার পত্রে উল্লেখিত গোত্রগুলো হচ্ছে মগ, মুরং, পাংখো এবং বনযোগী যারা এখনও পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করছে। আরাকান রাজা উভয় দেশের বন্ধুত্ব স্থিতিশীল রাখা এবং ব্যবসায়ী ও ভ্রমণকারীদের ব্যবহৃত রাস্তাগুলো নিরাপদ রাখার স্বার্থে একদল দস্যুদের পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে বিতাড়নের জন্য চট্টগ্রাম কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন।"[৩]

তৎকালীন উক্ত চিঠির কারণে এবং কাপ্তাই খালের পাড়ে অবস্থিত ইংরেজ দূর্গ আক্রান্ত হওয়ায় ১৮৫৯ সালে চট্টগ্রামের কমিশনার পার্বত্য অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রিত জেলার পরিবর্তে একজন সুপারিন্টেডেন্ট এর অধীনে আনার সুপারিশ করেন। এর ফলে ১৮৬০ সালের ২৬ জুনের 'নোটিফিকেশন নম্বর ৩৩০২' অনুসারে এবং একই সালের ১লা অগাষ্টের ' রেইডস অব ফ্রন্টিয়ার এ্যাক্ট ২২ অব ১৮৬০' অনুসারে বৃটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদা দেয়। জেলা শাসনের দায়িত্বভার দেওয়া হয় পাহাড় তত্ত্বাবধায়ক বা Hill Superintendent নামে একজন রাজ কর্মচারীর অধীনে। ১৮৮১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর বৃটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি সার্কেলে –চাকমা, মং ও বোমাং সার্কেলে বিভক্ত করে। পরবর্তীকালে প্রতিটি সার্কেলকে অনেকগুলো মৌজায় ভাগ করা হয় (১৯৩০ সালে মোট মৌজা ছিল ৩২৭ টি) ।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৮১ সালে ' পার্বত্য চট্টগ্রাম ফ্রন্টিয়ার পুলিশ এ্যাক্ট ' চালু করে পাহাড়ীদের সমন্বয়ে স্বতন্ত্র স্থানীয় পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলা হয়। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য তারা ব্যবহৃত হয়েছিল।

দুইশত বছর আগ থেকে এ অঞ্চলের প্রশাসনিক কাঠামো এমন যে, গ্রাম প্রধানকে 'কার্বারী', মৌজা প্রধানকে 'হেডম্যান' বলা হতো। হেডম্যানের সুপারিশে রাজা কার্বারী মনোনয়ন করেন এবং রাজার সুপারিশে সরকারের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসক হেডম্যান নিযুক্ত করেন। তবে জেলা প্রশাসক রাজার সুপারিশ মানতে বাধ্য ছিলেন না। গ্রাম বা মৌজায় ছোটখাটো অপরাধের বিচার ও সামাজিক দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি করতেন যথাক্রমে কার্বারী ও হেডম্যান। তাদের প্রচলিত প্রথা অনুসারে বিচার কার্য সম্পন্ন হতো। রাজ প্রথা বংশানুক্রমিক হলেও কার্বারী ও হেডম্যান প্রথা বংশানুক্রমিক নয়। তবে উপযুক্ত পুত্র সন্তান থাকলে বংশীয় দাবী অগ্রাধীকার পায়।

১৯০০ সালের ১লা মে বৃটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি-১৯০০ (Chittagong Hill Tracks Regulation 1900 Act) জারি করে। ১৯০০ সালের ১৭ মে কলকাতা গেজেটে এটি প্রকাশিত ও কার্যকর হওয়ার পর বহুবার এই আইনের সংশোধন করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই আইনের অন্তর্নিহিত কতিপয় ধারা পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর জন্য চরম অবমাননাকর ও প্রতিক্রিয়াশীল হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ কিন্তু এই এলাকার ভূমিতে তাদের অধিকারসহ পাহাড়ী জাতিসত্তাগুলোর সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র সংরক্ষণে ১৯০০ সালের শাসনবিধিকে রক্ষাকবচ হিসেবে মনে করেন।

১৯০০ সালের শাসনবিধির ৪২ ধারায় বলা ছিল জেলার ডেপুটি কমিশনার বা তার মনোনীত প্রতিনিধি ইচ্ছে করলেই উপজাতিদের বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদানে বাধ্য করতে পারবেন। পক্ষান্তরে এই আইন উপজাতিদের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান সার্কেল চিফ, হেডম্যান, কার্বারী এবং স্থানীয় বিচার রীতি, সংস্কার, কুসংস্কারসহ বেশ কিছু বিশেষ অধিকার নিশ্চিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০০ সালের শাসনবিধির ৩-৪ ধারায় বলা হয়েছে, বহিরাগত 'অ-উপজাতীয়দের জন্য' পার্বত্য চট্টগ্রামে জমি ক্রয় ও বন্দোবস্ত নিষিদ্ধ।

৫১ ধারায় এই রকমের বিধান ছিল যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ডিসি যে কোনো সন্দেহভাজন (অ-পাহাড়ী) ব্যক্তিকে অবাঞ্ছিত ঘোষনা করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে জেলা থেকে বহিষ্কার করতে পারবেন।

৫২ ধারায় বলা হয়েছে, জেলা প্রশাসকের অনুমতি ব্যতীত কোনো বহিরাগত অ-উপজাতি পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ ও বসবাস করতে পারবেনা। তারা জেলা প্রশাসকের অনুমতি নিয়ে কেবল হাটবাজার এলাকায় বসবাস করতে বা অস্থায়ী দোকানপাট স্থাপন করতে পারবে। অবশ্য ১৯৩৩ সালে এক সংশোধনী এনে এই আইন বাতিল করা হয়।

১৯০০ সালের শাসনবিধিতে উক্ত এলাকাকে ' অশাসিত বা অনিয়ন্ত্রিত '(নন রেগুলেটেড এরিয়া) ঘোষণা করা হয়, যা ১৯২০ সালে সংশোধন করে 'একান্ত এলাকা' বা 'এক্সক্লুসিভ এরিয়া' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯০০ সালের এই আইনের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটানো হয় যথাক্রমে ১৯২০, ১৯৩৩ ও ১৯৩৫ সালে।

তবে একথা সত্য যে ১৯০০ সালের আইন পার্বত্য চট্টগ্রামে অ-উপজাতীদের অভিবাসন বহুলাংশে রোধ করতে সক্ষম হয়েছিল। তাই অনেকে এই আইনকে হিল্ট্রাক্টস ম্যানুয়েলের হৃদপিণ্ড হিসেবে অবিহিত করেন।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে উপমহাদেশ বিভক্তি হওয়ার প্রশ্ন দেখা দিলে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। তারা পাকিস্তান অংশে নাকি ভারত অংশে থাকবে কিংবা কোনো অংশে না থেকে স্বাধীনভাবে থাকবে ইত্যাদি নিয়ে দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে। এ সম্পর্কে মোহন দেওয়ান লিখেন, " ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে আমরা হিন্দু-মুসলমান দুই সংখ্যাগোরিষ্ঠ জাতির শাসনাধীনে থাকিয়া স্বীয় জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার সম্ভাবনা আছে কিনা তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করার সময় উপস্থিত হইল। কাল প্রভাবে

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে আমরা নগণ্য সংখ্যায় পর্যবসিত হইলেও একসময় আমরা স্বাধীন ছিলাম। অতএব এই সুযোগে আমাদের পূর্ব গৌরব ও সংস্কৃতি রক্ষাকল্পে কিছুটা স্বায়ত্বশাসন লাভে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন"।[৪]

স্বায়ত্বশাসনের প্রকৃতি কেমন হবে তা নিয়েও পাহাড়ী নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। এ সম্পর্কে সিদ্ধার্থ চাকমা লিখেছেন, সার্কেল চীফদের কামনা ছিল রাজতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি। অন্যদিকে স্নেহ চাকমার নের্তৃত্বে জনসমিতির একাংশের দাবি ছিল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এবং অপর অংশের (কামিনী মোহন গ্রুপ) দাবি ছিল বৃটেনের অনুরূপ শাসন পদ্ধতি ।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভাগ অনিবার্য হয়ে উঠলে অ-মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠতার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ ভারতে যোগদানের চিন্তা ভাবনা করেন। এই লক্ষ্যে কামিনী মোহন দেওয়ান ও স্নেহ কুমার চাকমার নের্তৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল মহাত্মাগান্ধী, আচার্য কৃপালিনী, সর্দারলল্লভ ভাই প্যাটেল ও কংগ্রেস সভাপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতার সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাদের অবস্থা ব্যাখ্যা করেন। এমতাবস্থায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ রাঙামাটিতে একটি প্রতিনিধি দল ভারতে প্রেরণ করেন। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের মত পার্থক্যের কারণে বিশেষ করে তিন রাজা তাদের রাজত্ব ছাড়তে অনিচ্ছুক হওয়ায় কংগ্রেস প্রতিনিধি দল পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে কংগ্রেসের চাইতে মুসলিম লীগের আগ্রহ ছিল বেশি। মুসলিম লীগ যুক্তি হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ চাকমাদের মুসলিম নাম ও উপাধি ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ করেন [৫]। এমতাবস্থায় ১৯৪৭ সালের ৯ অগাষ্ট বেঙ্গল বাউন্ডারী এওয়ার্ড কমিশনের চেয়ারম্যান স্যার সিরিল রেডক্লিভ পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারত বিভক্তির সময়ে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত করার প্রস্তাব করেন এবং ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন সেটা অনুমোদন করেন।

১৯৪৭ সালের ১৪ অগাষ্ট স্নেহকুমার চাকমার নের্তৃত্বে প্রকাশ্যে রাঙামাটি জেলা প্রশাসকের অফিসের সামনে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। যা ২১ অগাষ্ট পাকিস্তান আর্মির একটি রেজিমেন্ট নামিয়ে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করে। অন্যদিকে বোমাং সার্কেলের মারমা জাতিগোষ্ঠীরা বার্মার সাথে যুক্ত হতে চেয়েছিল। পাকিস্তানের সাথে অন্তর্ভূক্তির প্রতিবাদে এবং বার্মার সাথে একাত্মতার ঘোষণার প্রতীক স্বরূপ বান্দরবানে বার্মার পতাকা উত্তোলন করে। সেখানেও পাকিস্তানের আর্মিরা বার্মার পতাকা নামিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করে। ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান সরকার তাদেরকে বিদ্রোহী, বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেন। পাকিস্তান সরকারের এই মামলায় কামিনী মোহন দেওয়ান, অঙ্গত দেওয়ান, প্রতুল দেওয়ান , ঘনশ্যাম দেওয়ান এই চার জন দুই মাস কারাদন্ড ভোগ করেন। স্নেহকুমার চাকমা ভারতে পালিয়ে যান (যিনি পরবর্তী কোনো এক সময়ে ত্রিপুরার প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন)।

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহিত হয়; তাতে ১৯০০ সালের রেগুলেশন অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম এক্সক্লুডেড এরিয়া'র মর্যাদা অব্যাহত রাখা হয়। তবে সেখানে হাইকোর্টের ক্ষমতা সম্পর্কিত ধারাতে কিছুটা সংশোধনী আনা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের হাইকোর্ট ' ১৯০০ সালের রেগুলেশন ' এর ৫১ ধারাকে সংবিধানের সাথে অতি সাংঘর্ষিক আখ্যা দিয়ে এটি রদ করে বলা হয় যে, ডেপুটি কমিশনার পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কাউকে বহিষ্কার করতে পারবেনা। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামই একমাত্র পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী পার্বত্য এলাকা নয় কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরাই কেবল পাকিস্তানের ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা ছিলনা। পাকিস্তান সরকার তার সীমান্তবর্তী পার্বত্য এলাকা এবং সকল ক্ষুদ্র জাতি গুলোর জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি অনুসরণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৯০০ সালের এ্যাক্ট বহাল থাকলেও ১৯৪৮ সালে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম পুলিশ এ্যাক্ট-১৮৮১ ' বাতিল করে দেওয়া হয়। লুপ্ত হয় পাহাড়ী পুলিশ বাহিনীর অস্তিত্ব।

CHTS Regulation 1900 Act এর ৩৯ ধারায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, " The Deputy Commissioner shall consult with the chiefs on important matters affecting the Administration of Chittagong Hill Tracts." অর্থ্যাৎ গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যাপারে জেলা প্রশাসক সার্কেল চীফ বা রাজাদের সাথে পরামর্শ করবেন। কিন্তু অভিযোগ থাকে যেকোনো পাহাড়ী নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ ছাড়াই ১৯৫৮ সালে কাপ্তাই বাঁধের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। যার পরিণতিতে এক লক্ষ পাহাড়ী মানুষ বাস্তুভিটা ও জমিহারা হয়ে পড়ে। পুরনো রাঙামাটি শহর চিরদিনের জন্য কাপ্তাই হ্রদের পানিতে ডুবে যায়। চাষাবাদযোগ্য জমির ৫৬.০৬% তথা ৫৪ হাজার একর জমি পানিতে তলিয়ে যায়। অবশ্য তৎকালীন রাজা ত্রিদিব রায় পুনর্বাসনের জন্য পাকিস্তান সরকারের কাছে যে প্রস্তাব রাখেন, পাকিস্তান সরকার তা অনুমোদন করেন। যার ফলে রিজার্ভ ফরেস্টেও কিছু অংশ পুনর্বাসনের জন্য খালি করে দেওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬২ সালে প্রণীত নতুন সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ মর্যাদা এক্সক্লুডেড এরিয়া পরিবর্তন করে 'ট্রাইবাল এরিয়া' উপজাতীয় এলাকার মর্যাদা দেওয়া হয়। ১৯৬৪ সালে এই বিশেষ মর্যাদাও বাতিল করা হয় তবে ১৯০০ সালের রেগুলেশন বাতিল করা হয়নি।

১৯৭১ সালের ২১ অক্টোবর প্রকাশিত এক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বন্দোবস্ত, ভূমি লিজ, ভূমি হস্তান্তর প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত রেগুলেশন-১৯০০ এর ৩৪ ধারায় উল্লেখযোগ্য সংশোধনী আনেন। সংশোধনীতে দুটি উল্লেখযোগ্য অনুচ্ছেদ অন্তর্ভূক্ত ছিলঃ

ক) পাহাড়ী এবং অ-পাহাড়ী উভয়ে সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় অন্তত ১৫ বছর যাবৎ বসবাস করছেন এমন ব্যক্তিই অ-পাহাড়ী বলে সংজ্ঞায়িত হবে।

খ) পাহাড়ী বা অ-পাহাড়ী তথা অন্য যেকোনো এলাকার অধিবাসী পূর্ব পাকিস্তান রাজস্ব বোর্ডের অনুমতিক্রমে পার্বত্যাঞ্চলে চত্বর চাষাবাদ, রাবার চাষ, শিল্প স্থাপন এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় বাড়িঘর নির্মাণের যোগ্য হবেন।

পাহাড়ীদের কাছে এটি ছিল বাঙালী বসতি স্থাপনের সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত। সংবিধানের উপরোক্ত সংশোধনী পাহাড়ীদের আবেদনের পেক্ষিতে পাকিস্তান আমলে কার্যকর হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর " Chittagong Hill Tracts Regulation " আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে বলবৎ করা না হলেও তা পার্বত্য চট্টগ্রামে বলবৎ থাকে কারণ, তা কোনোদিন বাতিল করা হয়নি [৬]।

দেশ বিভাগের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪৪ টি অথচ ১৯৬৯ সালের জুন নাগাদ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯১ তে (CHT District Gazetters 1971)। বর্তমানে শুধু রাঙামাটিতেই প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৫১৮ টি। তারমধ্যে সরকারি ৩৯১ টি এবং বেসরকারি ১২৭ টি। মাধ্যমিক বিদ্যঅলয় আছে ৫৪ টি। তারমধ্যে সরকারি ৬ টি এবং বেসরকারি ৪৮ টি। কলেজ আছে ২ টি, দুটোই সরকারি। পাহাড়ীদের জীবন মান উন্নয়নে সেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিল্প কারখানা স্থাপন করা হয় যেমন, কর্ণফুলী বহুমুখী প্রকল্প (১৯৬০), কর্ণফুলী পেপার মিল(১৯৫২), কর্ণফুলী রেয়ন এন্ড কেমিক্যাল লিঃ (১৯৬৬) প্রভৃতি। তাদের জীবন মান উন্নয়নে সরকারের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পাহাড়ী নেতৃবৃন্দের মনে ক্ষোভ ও ঘৃনার সঞ্চার হতে থাকে। এই কারণেই যে, পাকিস্তান আমলে বাঙালী

Dhaka University Institutional Repository

অভিবাসন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে বলে তারা মনে করে। কারণ ১৯৪৭ সালে সেখানে পাহাড়ী ও অ-পাহাড়ী জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৯৭% এবং ৩% সেখানে ১৯৭০ সালে এই অনুপাত দাঁড়ায় ৮৫% ও ১৫% ।[৭] বর্তমানে এই অনুপাত প্রায় সমান সমান।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্রঃ

১। ডঃ হাসানুজ্জামান চৌধুরী, অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, দৈনিক ইনকিলাব, ১৯৯৭,

২। মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহীম বীর প্রতীক: পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ পরিস্থিতি মূল্যায়ন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা:২২

৩। মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহীম বীর প্রতীক: পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ পরিস্থিতি মূল্যায়ন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা:২৫

৪। কামনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টলের এক দীন সেবকের জীবন কাহিনী, রাঙামাটি, দেওয়ান মওলা ব্রাদার্স এন্ড কোং ১৯৯৭, পৃষ্ঠা:১৮

৫। সিদ্ধার্থ চাকমা, প্রসঙ্গঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম, নাথ ব্রাদার্স, কলিকাতা ১৩৯২, পৃষ্ঠা: ১৩

৬। চিন্ময় মুৎসুদ্দী, অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, আগামী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা: ৭

৭। জেলা পরিষদ: রাঙ্গামাটি

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাহাড়ে শান্তি প্রক্রিয়া

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

পাহাড়ে শান্তি প্রক্রিয়া:

৬.১ কেন এই সংঘাত:

কিছুদিন আগ পর্যন্ত প্রায় সিকি শতাব্দীধরে আমরা আমাদের জাতির নিজেদেরই একটা অংশের সাথে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কেমন করে আমরা এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লাম ? কেন এবং কখন জাতির একটা অংশ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয় ? শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের আশা ত্যাগ করে একটি জনগোষ্ঠী কেন অস্ত্র হাতে তুলে নেয় ? এসব প্রশ্নের উত্তর আমাদের কাছে অজানা নয়। কারণ এই ধরনের ঘটণা এই উপমহাদেশের সুদূর অতীতে বার বার ঘটেছে।

কোনো একটা রাষ্ট্রের একটা জনগোষ্ঠী যদি নিপীড়িত হয় কিংবা ভবিষ্যতে নিপীড়িত হবার আশংকায় ভীত হয়ে ওঠে এবং তা থেকে আত্মরক্ষার জন্য স্বায়ত্বশাসন বা বিশেষ আইনগত সুযোগ কিংবা সাংবিধানিক রক্ষাকবচ পাওয়ার দাবি করে, তাহলে তাদের সাথে সংঘাতের পথে না গিয়ে, বরং তাদেরে মন জয় করে, তাদের সবরকম ভয়ভীতি দূর করার জন্য যা কিছু করণীয় তাই করা উচিত। তা না করে অহেতুক সার্বভৌমত্ব বিপদগ্রস্থ হবে, শাসনতন্ত্রের পবিত্রতা বিনিষ্ট হবে ইত্যাদি গুরু গম্ভীর শব্দের আড়ালে দমন পীড়ন দিয়ে, সন্ত্রাস দিয়ে তাদের ন্যায্য দাবিকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করলে তার ভবিষ্যত ভালোতো হয়ইনা বরং শেষ পর্যন্ত দেশের অখণ্ডতা পর্যন্ত বিপর্যস্ত অথবা বিনিষ্ট হতে পারে।

বর্তমান শান্তিচুক্তির আগে প্রায় সিকি শতাব্দীকাল পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বাঙালীদের যুদ্ধ চলছিল। এই যুদ্ধ কেন শুরু হলো তা জানতে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে আমাদের দেশের সহজ সরল, শিক্ষাদীক্ষায় ও অর্থনীতিতে পিছিয়ে পড়া একটি ছোট্ট জনসংখ্যার এই পাহাড়ী জনগোষ্ঠী কী এমন চেয়েছিল যা আমরা দিতে পারিনি ?

ফ.র.আল সিদ্দিক বাঙালীর জয় বাঙালীর ব্যর্থতা নামক গ্রন্থে এই যুদ্ধের কারণ হিসেবে কিছু যুক্তি তুলে ধরেন। তিনি বলেন–"পাহাড়ী জনগোষ্ঠী তাদের সংস্কৃতিগত, জাতিগত, অঞ্চলগত স্বাতন্ত্র্য যেন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চাপে হারিয়ে না যায় তা নিশ্চিত করতে চেয়েছিল। সমভূমি অঞ্চলের বাঙালীরা গিয়ে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

উপরে যে অর্থনৈতিক নিপীড়ন করেছে সেকথা তারা উপলব্ধী করলেও প্রথমদিকে অতটা বিচলিত হয়নি"।

তিনি আরো মনে করেন যে, "নিপীড়িত জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক নিপীড়নের চেয়ে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনই বেশি আহত করে। এই উপমহাদেশের প্রথম যুদ্ধ (১৮৫৭) যাকে ইংরেজরা সিপাহী বিদ্রোহ নাম দিয়ে চালিয়ে দিতে চেয়েছিল, সেখানেও আমরা দেখতে পাই যে, ইংরেজদের অর্থনৈতিক শোষন ও নিপীড়নের চেয়ে বন্দুকের টোটায় শূকর ও গরুর চর্বি মাখানোর গুজব থেকে উদ্ভুত ধর্মভয়ই স্বাধীনতা যোদ্ধাদের এই যুদ্ধে অংশগ্রহনের জন্য বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল"।

তিনি আরো বলেন, "পাকিস্তান আমলেও, বাঙালীদের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানী ও বিহারীদের অর্থনৈতিক শোষন আমাদেরকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যতটা উদ্বুদ্ধ করেছিল, তারচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিল আমাদের ভাষার উপরে যখন আঘাত এসেছিল"। তাই আমাদের দেশের পার্বত্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠী যখন তাদের সংস্কৃতিকে এবং জাতিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার নিশ্চয়তা দাবী করলো তখন আমরা তাদের সেই অনুভূতিকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করিনি। তার বদলে লিপ্ত হয়েছি তাদের সাথে সংঘর্ষে।

এই উপমহাদেশের যে মুসলিম জনগোষ্ঠী তাদের ধর্মীয় ও সাস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে নিগৃহীত হবার ভয়ে স্বায়ত্বশাসন চেয়ে দীর্ঘদিন আন্দোলন করে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান কায়েম করেছিল, যে বাঙালী জাতি তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য এবং অর্থনৈতিক নিপীড়নের হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রথমে স্বায়ত্বশাসন চেয়েছিল এবং তা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক সরকারের হাত থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করে স্বাধীন করেছে। সেই মহান বাঙালী জাতি কেন তাদের দেশেরই একটা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার দাবি, একটা স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী হিসেবে নিজস্ব বৈচিত্র্য নিয়ে টিকে থাকার দাবি, তাদের আঞ্চলিক দাবিকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করতে পারলনা [১]?

১৬ কোটি জনঅধ্যুষিত এই বাংলাদেশের পাহাড়ে ও সমতলে যেসব আদিবাসী আছে, তারা শত শত বছর ধরে বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার। বরাবর তারা নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে আছে। অথচ সংখ্যাগুরু

Dhaka University Institutional Repository

জনগোষ্ঠী, শাসকবর্গ কখনোই তাদের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেনি। ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানেও আদিবাসীরা অধিকারহারা। বাহাত্তরে রচিত সংবিধানকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান বলে অভিহিত করা হয়। অথচ তাতেও ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর স্বীকৃতি নেই।

গেল শতকের সাত ও আটের দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল, এরও মূলে ছিল পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বঞ্চনা। তাদের রাজনৈতিক সংগ্রাম দীর্ঘদিনের। পঞ্চদশ শতকে মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত হয়ে চাকমা জনগোষ্ঠী এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। পরে মুরং, ম্রো, বম ও ত্রিপুরাসহ অন্যান্য আদিবাসীও বসতি গড়ে তোলে। তারা বরাবরই ছিল স্বাধীনচেতা। অষ্টাদশ শতকে ব্রিটিশ শাসকেরা পার্বত্য চট্টগ্রাম দখলে নিলে আদিবাসীরা প্রতিবাদ জানায়। এর আগে মুঘলদের দখলদারি তারা মেনে নেয়নি। ব্রিটিশ সরকার ১৯০০ সালে জারি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর বিরোধিতা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রথম থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পাহাড়িদের প্রতি বৈরী ছিল। ১৯৬৩ সালে কাপ্তাই বাঁধ চালু হলে হাজার হাজার আদিবাসী বাস্তুচ্যুত হয়। অনেকে ভারতে আশ্রয় নেয়, অনেকে উদ্বাস্তু জীবন যাপন করে। পাহাড়ীদের দুঃখ-কষ্টের শুরু সেখান থেকেই। পরে পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবর্তিত বিশেষ শাসনবিধিও বাতিল করে দেয়। আশা করা গিয়েছিল, স্বাধীনতার পর 'বাঙালি' শাসকেরা তাদের ন্যায়সংগত অধিকার মেনে নেবেন। বাস্তবতা ছিল ঠিক তার বিপরীত। ১৯৭২ সালের গণপরিষদে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর একমাত্র প্রতিনিধি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করে চার দফা দাবি পেশ করেছিলেন। দাবীগুলো হলো:

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম হবে একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল।

২. ১৯০০ সালের শাসনবিধি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩. আদিবাসী রাজা ও হেডম্যানরা অবশ্যই বহাল থাকবেন।

৪. সংবিধানে এই নিশ্চয়তা থাকতে হবে যে ১৯০০ সালের বিধিসমূহ রদবদল করা হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসা বাঙালী শাসকগোষ্ঠী কয়েক লাখ পাহাড়ী জনগণের দাবি শুধু অগ্রাহ্যই করেনি, সংবিধানে বাংলাদেশের নাগরিকদের একমাত্র বাঙালী পরিচয় দিয়ে তাদের জাতিসত্তাকেও নাকচ করে দেয়। এতে অন্যান্য আদিবাসীর মতো পাহাড়ী জনগোষ্ঠীও ক্ষুব্ধ হয়। মানবেন্দ্র লারমা গণপরিষদ ও জাতীয় সংসদে তীব্র ভাষায় এর প্রতিবাদ জানান। ১৯৭২ সালের ২১ অক্টোবর, যে দিনটিতে সংবিধানের এ-সংক্রান্ত ধারাটি পাস হয়, সেদিন তিনি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বসবাস করে আসছে। বাংলা ভাষায় বাঙালিদের সঙ্গে লেখাপড়া শিখে এসেছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ-দাদা চৌদ্দগুষ্টি—কেউ বলে নাই, আমি বাঙালী।

পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে গঠিত হয় জনসংহতি সমিতি, মানবেন্দ্র লারমা হন এর সভাপতি। পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন কেবল বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চরিত্রই বদলে দেয় না, পাহাড়ীদেরও ফেলে দেয় এক অনিশ্চিত যাত্রায়। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত জনসংহতি সমিতি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে আসছিল। ১৬ আগস্ট মানবেন্দ্র লারমা সমর্থকদের নিয়ে আত্মগোপনে চলে যান। তিনি বুঝতে পারছিলেন, বাঙালী জাত্যভিমানের সঙ্গে বোঝাপড়া করা গেলেও সামরিক শাসকের দৌরাত্ম্য ঠেকানো যাবে না। অতএব তাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নিলেন। গঠিত হলো জনসংহতি সমিতির সামরিক শাখা 'শান্তি বাহিনী'।

পরবর্তী ইতিহাস রক্তের অক্ষরে লেখা। প্রায় দুই দশক ধরে পাহাড়ে চলেছে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ, রক্তের ধারায় সিক্ত হয়েছে সবুজ বনভূমি, শস্যক্ষেত পরিণত হয়েছে রণাঙ্গনে। বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল বারুদের গন্ধে। নানা অভিযান, অপারেশন ব্যর্থ হওয়ার পর শাসকদের বোধোদয় ঘটে। তাঁরা শান্তির প্রক্রিয়া শুরু করতে আলোচনায় বসেন পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব দানকারী জনসংহতির সঙ্গে। অবশেষে বহু প্রাণ হরণ ও রক্তপাতের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর। তখন ক্ষমতায় ছিল আওয়ামী লীগ। তবে পূর্ববর্তী সরকারগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। জিয়াউর রহমানের শাসনামলে জনসংহতি সমিতি তথা শান্তি বাহিনীর সঙ্গে যে আলোচনার সূত্রপাত হয়, এরশাদ ও খালেদা জিয়ার সরকারের সময়ও তা অব্যাহত থাকে। ১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে শান্তি প্রক্রিয়া গতি পায়, পার্বত্য চট্টগ্রামে তিন জনপ্রতিনিধিই ছিলেন আওয়ামী লীগের। ফলে তাঁরা সরকার ও জনসংহতির মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করেন। শান্তিচুক্তির আগে জনসংহতি সমিতির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে জিয়া সরকার তিন দফা, এরশাদ সরকার পাঁচ দফা, খালেদা জিয়া সরকার সাত দফা ও শেখ হাসিনা সরকার ছয় দফা বৈঠক করেছে। ২ ডিসেম্বর ২০০৯, পার্বত্য চুক্তির ১২ বছর পার হয়ে গেছে। প্রশ্ন উঠেছে, এ চুক্তির মধ্য দিয়ে কী অর্জন করেছে রাষ্ট্র? কী পেয়েছে পাহাড়ী জনগোষ্ঠী [২]?

Dhaka University Institutional Repository

জুম পাহাড়ে শান্তির খোঁজে

পাহাড়ী ক্ষুদ্র জাতিসত্তা-গুলো সম্পর্কে এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে অনেক অনেক কথা বলা দরকার। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তবতা বিষয়ে বাংলার মানুষকে যথেষ্টভাবে এবং ব্যাপকভাবে অবহিত করা হয়নি। পাহাড়ীদের সমস্যা নিয়ে অনেক কথা হয় সত্য, কিন্তু একে সব মহল থেকে জাতীয়ভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। তথ্যের অভাব থেকে ভুল বোঝাবুঝিরও সৃষ্টি হয়, এ জন্যই নির্লিপ্ত ভাব চলে আসে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তাবিষয়ক সমস্যাকে কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তবতায় নয়, সারা দেশের বাস্তবতা থেকেও দেখা উচিত। সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী বিচ্ছিন্ন কেউ নয়, তারা বাংলাদেশের সমগ্র জনগণেরই অংশ। জনগণের সব অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও মানবিক আদান-প্রদান না থাকা কোনো কাম্য অবস্থা নয়। সে কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে সমগ্র দেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর জন্য করণীয়ের অংশ হিসেবে দেখা দরকার। এটি কেবল এনজিও বা অন্য কোনো গোষ্ঠীর সভা-সমিতি-সেমিনারের বিষয় নয়। একে

Dhaka University Institutional Repository

গোষ্ঠীগত স্বার্থের হাতে রেখে দেওয়াও ঠিক নয়। আঞ্চলীক ও জাতীয় , উভয় অবস্থান থেকেই এর, সমাধান করতে হবে।

৬.২ প্রথমেই ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি করতে হবে:

পার্বত্য চট্টগ্রাম আবারো অশান্ত, বাঙালী পাহাড়ী সংঘর্ষ, অপহরণ এসব আমরা পত্রিকার পাতা উল্টালে দেখতে পাই। অর্থাৎ এসব নিত্যনৈমেত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এতে শুধু যে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা নয় বাঙালী ঐসব সংঘর্ষরত পরিবারও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, চরম অশান্তির মধ্যে কাটছে সকলের জীবন। পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি ও চুক্তির বাস্তবায়নে এ ঘটণাগুলো ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। চুক্তির একযুগ পরে সংঘটিত এসব ঘটণাই বলে দেয় পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রক্রিয়া কোন্ পর্যায়ে রয়েছে। এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্যনীয়, পাহাড়ী ও বাঙালীর মধ্যে সংঘটিত ঘটণাগুলোকে কিছু মহল আঞ্চলিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণ হিসেবে উল্লেখ করে প্রকৃত ঘটণা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

মহাজোট সরকারের প্রধান শরিকদল আওয়ামীলীগ তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে দিন বদলের অঙ্গীকারের সাথে এই অঙ্গীকারও করেছিল, পার্বত্য চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন করে পাহাড়ে শান্তি ফিরিয়ে আনবে। আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার দুইবছর পার হয়ে গিয়েছে । এরমধ্যে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় কমিটি, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়াম্যান নিয়োগ,পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় শরণার্থী ও অভ্যন্তরীন উদ্বাস্তু পূর্ণবাসন টাস্কফোর্স গঠন করেছে। রাঙামাটি ও বান্দরবান জেলা পরিষদের অন্তরবর্তীকালীন পরিষদ গঠন করা সম্ভব হয়েছে এবং ভূমি কমিশনের পূনর্গঠনের কাজ চলছে। সংসদ উপনেতা সাজেদা চৌধুরিকে প্রধান করে তিন সদস্য বিশিষ্ট 'চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি' গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন উপজাতীয় শরণার্থী ও অভ্যন্তরীন উদ্বাস্তু পূর্ণবাসন টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্তু লারমা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা দীর্ঘ দিনের। এই সমস্যা নিরসনকল্পে চুক্তি মোতাবেক 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি আইন' প্রণিত হয়েছে। কিন্তু এই আইনে এমন কিছু ধারা অন্তভূক্ত করা হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

যেগুলো পার্বত্য চুক্তির সঙ্গে বিরোধাত্মক।এই সংঘর্ষপূর্ণ ধারাগুলো আজো সংশোধন করা হয়নি। ফলে ভূমি কমিশনের এই অমিমাংশিত ধারা দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ সম্ভব নয় বলে পাহাড়ী আদিবাসীরা মনে করেন। পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী ভূমি কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের যেসব জায়গা জমি সংক্রান্ত যেসব বিরোধ রয়েছে সেগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করা। এছাড়া যেসব পাহাড় ও জমি বেদখল হয়েছে এবং অবৈধভাবে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে সেসব পাহাড় এবং ভূমির মালিকানা স্বত্ব প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা কমিশনের থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৯৯ সালের জুন মাসে ভূমি কমিশন গঠিত হলেও ৬ বছর পরে ২০০৫ সালের ৮ জুন প্রথম সভা বাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠীত হয়েছিল। সেই সভাতে পার্বত্য চুক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভূমি কমিশনের আইন সংশোধনের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু তা আর করা হয়নি। একসময় ভূমি কমিশনের কার্যক্রমও স্থবির হয়ে পড়ে।

একদিকে ভূমি কমিশনকে অকার্যকর করে ফেলে রাখা হয়েছে, অন্যদিকে পাহাড়ে বারবার বহিরাগত পূণর্বাসিত বাঙালীদের (সাধারণ সেটলার বাঙালী নামে পরিচিত) দ্বারা ভূমি দখলের ঘটণা সংঘঠিত হচ্ছে। এমনকি পাহাড়ীদের ধর্মীয় উপাসনালয় নির্মাণেও প্রশাসন থেকে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। পূণর্বাসিত বাঙালীদের দ্বারা ভূমি বেদখলের ঘটণা ঘটছে অথচ মামলা দিয়ে পাহাড়ীদের নামে ভূমি বেদখলের অভিযোগ আনা হচ্ছে। এমনকি পাহাড়ীদের 'অনুপ্রবেশকারী' আখ্যা দেওয়ারও ঘটণা ঘটছে। পাহাড়ীদের ভূমি দখলের পর তাদেরই আবার দখলদারী আখ্যা দেওয়ার পেছনে সুদূর প্রসারী নীল নকশা রয়েছে বলে অনেকে ধারণা করেন। এ বিষয়গুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

পার্বত্য চুক্তির প্রায় একযুগ পেরিয়ে গেলেও চুক্তি বাস্তবায়ন যেমন হয়নি তেমনি চুক্তির অন্যতম প্রধান শর্ত ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গঠিত কমিশনও তেমনভাবে কাজ শুরু করতে পারেনি। বর্তমান সরকার

Dhaka University Institutional Repository

বারবার চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের কথা বলছেন। কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তিতে হাত দিতে হবে। কেননা যতদিন ভূমি সমস্যার সমাধান হবেনা ততদিন পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা সম্ভব হবেনা।

১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সময় যে যেখানে যেমনভাবে ছিল তাকে সেখানেই অবস্থান করতে হবে– এরকম একটা দাবি ছিল। এতে ভূমি কমিশনের কাজ পরিচালনা করা সহজ হবে। কিন্তু চুক্তির পরেও দেখা গেছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আমলা, ব্যবসায়ী, এনজিও সমূহ পাহাড়ের হাজার হাজার জমি লিজ নিয়েছে, সরকারী সংস্থার নামে ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, পূর্ণবাসিত বাঙালীদের নামে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। কাজেই সেসব ইজারা, অধিগ্রহণ, বন্দোবস্ত বাতিল না করে ভূমি কমিশন কোনো সমাধানে পৌছাতে পারবেনা। শুধু ভূমি সমস্যার সমাধান নয়, এযাবৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে যতগুলো হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটেছে সেগুলোরও বিচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন[৩]।

২০১০ সালের এপ্রিল মাসের শুরুতে ভূমি কমিশন সন্তু লারমা সহ পার্বত্য তিন জেলার রাজাদের সাথে বৈঠক করতে চাইলে তারা বসতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা দাবি করে আগে ভূমি কমিশন আইন সংশোধন করা হোক তারপরে বৈঠক করা যাবে[৪]।

পার্বত্য চট্টগ্রাম তো বটেই, অন্য যে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো সারা দেশে– ময়মনসিংহ দক্ষিণ বাংলায় রয়েছে, এদের সবার সমস্যার গোড়ায় রয়েছে ভূমি নিয়ে জটিলতা। দিনের পর দিন নিজস্ব ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে এদের অধিকাংশই ভূমিহীনে পরিণত হয়েছে। ভূমি হারিয়ে সামাজিকভাবেও তাদের অবস্থান নাজুক হয়ে গেছে। ২০ বছর আগেও এদের হাতে যা জমি ছিল এখন তার অনেকটুকুই নেই। ভূমি হারানোর অসন্তোষ, দারিদ্র্য এবং স্থানীয়ভাবে নিগৃহীত হওয়া মিলিয়ে তারা বঞ্চিত জনসম্প্রদায়। আইনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসন যদি তৎপর, সজাগ ও সহানুভূতিশীল থাকত, তাহলে তাদের বঞ্চনা অনেকটা কমে যেত। এবং এই কাজ আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বা পদ্ধতি দিয়ে হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি নিয়ে বিবাদ নিরসনে ভূমি কমিশন গঠন করা হয়েছিল, কিন্তু তা সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। অনেক বাধা-বিপত্তি ছিল। বর্তমানে নতুন করে যে কমিশন গঠিত হয়েছে, তারা স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে অগ্রসর হতে পারে। তবে সমতলের ভূমিব্যবস্থার সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত ভূমিব্যবস্থার অনেক অমিল রয়েছে। তাই সমতলে ভূমি-প্রশাসনের কাজের ধারা সেখানে প্রযোজ্য হবে না। পাহাড়ীদের নিজস্ব ঐতিহ্যভিত্তিক ভূমির মালিকানা ও বন্টন-নীতিকে বুঝে এ সমস্যায় হাত দিতে হবে। এটা করতে গিয়ে সেখানে নতুন করে কোনো বিভাজন সৃষ্টি করা যাবে না। সমস্যাটিকে সামগ্রিকভাবেই সমাধান করতে হবে।

যাঁরা ওই অঞ্চলের বাস্তবতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখেন এবং সেখানকার ভূমি বন্দোবস্ত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেন, এ কাজে তাঁদের সহযোগিতা প্রয়োজন। যা করার ঐতিহ্যিক ভূমিব্যবস্থা সম্পর্ক জেনে-বুঝেই করতে হবে।পার্বত্য এলাকার ভূমি প্রশ্নের আরও কিছু দিক রয়েছে। যেমন কাপ্তাই হ্রদের চারপাশে একটি বানভাসী এলাকা রয়েছে। এসব জমির চাষাবাদের সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে আইনের অস্পষ্টতা রয়েছে। এ জমিগুলো যাতে আদিবাসীরা ব্যবহারের সুযোগ পায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া যারা সেখানে পশুপালনে জড়িত কিংবা ফলের বাগান, খামার ইত্যাদি রয়েছে যাদের, তাদের ঋণ দিয়ে সহযোগিতা করতে হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফল-সবজির যে চাষাবাদ হয় সেগুলোর বাজারজাতকরণের ব্যবস্থাও করা দরকার। এসব যেন মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে না পড়ে, সেদিকেও লক্ষ রাখা চাই। পার্বত্যবাসীর জীবিকার সমস্যা লাঘব হলে সব দিকেই অগ্রগতি ঘটবে। স্থানীয় পরিষদ ও জেলা প্রশাসন এ ব্যাপারে সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যবস্থা নিতে পারে। পরিবেশ ও বনভূমির বন্দোবস্তটি এ ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যুগ যুগ ধরে অরণ্য-পাহাড়-টিলায় তাদের বসবাস এবং এর ওপরই তারা নির্ভরশীল। অথচ তাদের নিজেদেরই বনায়ন করা অরণ্য থেকে তাদেরই বঞ্চিত করা হয়। বন বিভাগের তরফে এই হয়রানিগুলো বন্ধ করতে হবে। বনভূমির ওপর ঐতিহাসিকভাবে তাদের জীবিকার যে অধিকার তা নিশ্চিত রাখতে হবে। যে পরিবেশে তারা লালিত-পালিত হয়েছে, সেই পরিবেশ যাতে নগরায়ণের কারণে নষ্ট না হয়, সেটাও খেয়াল রাখতে হবে।ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো আমাদেরই সমাজের অংশ। আমরাই নানান অন্যায়ের মাধ্যমে তাদের দূরে ঠেলে দিয়েছি। যত দিন আমরা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতিকে সম্মান করতে না পারব, তত দিন সমস্যা মিটবে না। এটা আমাদেরই দায়। জনগণের সঙ্গে জনগণের মৈত্রী প্রতিষ্ঠা না হলে দেশই দুর্বল হয়ে থাকবে, এটা আমাদের বুঝতে হবে। আমাদের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় আয়োজন দিয়ে তাদের সুরক্ষা দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তারা বাংলার বৃহত্তর সমাজের অংশএই অনুভূতি আমাদেরই অর্জন করতে হবে। গোড়া থেকেই সরকারের নজরে যদি তাদের মঙ্গলের বিষয়টা থাকত, তাহলে আদিবাসীরা বিচ্ছিন্ন বোধ করত না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার অন্যতম দিক হচ্ছে ভূমিসমস্যা। পার্বত্য চট্টগ্রামে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ এমনিতেই অত্যন্ত কম। অধিকন্তু ১৯৬০ সালে কাপ্তাই নির্মিত হওয়ার ফলে ৫৪ হাজার একর চাষযোগ্য জমি বাঁধের পানিতে তলিয়ে যায়। অধিকন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে বিপুল পরিমাণ আবাদযোগ্য জমি রয়েছে– এই প্রতারণামূলক অজুহাত দেখিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৭৯ সাল থেকে দেশের সমতল জেলাগুলো থেকে চার লক্ষাধিক বহিরাগত বাঙালিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসে এবং এসব সেটেলার বাঙালি প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদদে জুম্মদের জায়গাজমি দখল করে নেয়। এভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিসমস্যা জটিলতর হয়ে ওঠে। ভূমিসমস্যাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুসারে সমাধানের লক্ষ্যে চুক্তিতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি ভূমি কমিশন গঠন করার বিধান হয়েছে। সে অনুযায়ী ভূমি কমিশন গঠিতও হয়েছে। কিন্তু ২০০১ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন চুক্তি অনুযায়ী প্রণীত না হওয়ায় ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তির কাজ শুরু হয়নি। ভূমি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারাগুলো সংশোধনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ থেকে ১৯ দফাসংবলিত সুপারিশমালা সরকারের কাছে পেশ করা হয়। আজ অবধি ওই বিরোধাত্মক ধারাগুলো সংশোধন করা হয়নি। অচিরেই আইন সংশোধন করা বাঞ্ছনীয়। অধিকন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের বিধিমালা এখনো প্রণীত হয়নি। প্রয়োজনীয় জনবল ও পরিসম্পৎসংবলিত কমিশনের স্বতন্ত্র কার্যালয় স্থাপিত হয়নি। এগুলো করা জরুরি।

আদিবাসী ও পাহাড়ীদের বঞ্চনার ইতিহাসের শুরু ভূমি দখলের মধ্য দিয়েই। তারপর চলে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, যার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্যের নামে বঞ্চনার চূড়ান্ত ঘটানো হচ্ছে। ৭ জুলাই ২০০৯, রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশনের মিলনায়তনে রিসার্চ এ্যান্ড ডেভলপমেন্ট কালেক্টিভস (আর ডি সি) ও একশন এইড বাংলাদেশের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় দুইদিন ব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন। বিষয় ছিল " বৈচিত্র্যের পরিপ্রেক্ষিত থেকে দলিত ও আদিবাসীদের প্রতি বৈষম্য, বাদ পড়ে যাওয়া ও প্রান্তিকতা"। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেন-" এ থেকে বের হতে হলে কারা বঞ্চনা করছে তা চিহ্নিত

Dhaka University Institutional Repository

করে, কীভাবে তাদের নিষ্ক্রীয় করা যায়, সেই কৌশল নির্ধারণ করাটা জরুরী। আর এর জন্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক ঘরানার লোক খুঁজে বের করতে হবে"।

একই অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন-" বৈষম্য বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে যেমন আছে তেমনি আছে জাতীয় পরিসরেও। আমি আমার ভাষায় যোগাযোগ করতে না পারলে, দাবী উত্থাপন করতে না পারলে নিজেকে শক্তিশালী মনে হয়না"। তিনি আরো বলেন-"মানুষের সমানাধীকার নিশ্চিত করতে না পারলে গণতন্ত্র আসবেনা। আর প্রত্যেকের অধিকার পূরণ করতে হলে শিক্ষিত জাতি দরকার। যেটা সম্ভব নিজ নিজ মাতৃভাষার শিক্ষার মাধ্যমে"।

অধ্যাপক মেসবা কামাল বলেন-"দারিদ্রকে বুঝতে হলে দলিত ও আদিবাসীদের প্রতি যে বৈষম্য সেটাকে বুঝতে হবে"। আন্তর্জাতিক পরিসরে বিষয়গুলোর যোঝাপড়া করার জন্য উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন–"জনগোষ্ঠীর একটা অংশকে বাদ দিয়ে এগিয়ে যাওয়াকে সামগ্রীক উন্নয়ন হিসেবে ধরার কোনো উপায় নেই"।

৬.৩ ভূমি কমিশন গঠন:

বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহনের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী বাঙালী সবার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে পার্বত্য ভূমি কমিশন গঠন করা হয়েছে। কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম। কমিশনের কাজ হবে ভূমি সংক্রান্ত জটিলতাগুলোর দ্রুত সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করা। প্রয়োজনে জরিপ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির একটা সার্বিক চিত্র বের করা।সম্প্রতি চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় বলেন, ভূমি কমিশন আইনে কিছু সমস্যা রয়েছে বিধায় এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ থেকে মন্ত্রনালয়ে পাঠানো হয়েছে। প্রস্তাবে যেসব উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো, পার্বত্য চুক্তির সঙ্গে অসঙ্গতি গুলো দূর করা, কমিশন যাতে দ্রুত ও ন্যায়ের পথে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে তার ব্যবস্থা নেওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম বলেন- কমিশন বর্তমানে ভারত থেকে ফিরে আসা শরণার্থীদেও পূণর্বাসন, বেআইনিভাবে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া, এরকম বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছে। তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি শ্রেণী বিভক্ত নয়। তাছাড়া ভূমির একটা বড় অংশ পরিচিহ্নিত নয়।কমিশন এইসব বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনায় বসবে। কমিশন ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তিতে আশাবাদী। সরকারেরও এবিষয়ে সহযোগিতার মনোভাব রয়েছে। তবে কমিশনের জনবল না থাকাকে তিনি একটি বড় প্রতিবন্ধকতা করেন[৫]।

৬.৪ নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অধিকার:

ভূমি-কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ভাষার ওপর আমাদের যেমন অধিকার, তাদেরও তেমনই মৌলিক অধিকার। এটা আমাদের বদান্যতার বিষয় নয়। প্রয়োজনে সংবিধানের মাধ্যমে এই অধিকারগুলোকে বিশেষভাবে রক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। গণমাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়ারও এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখার সুযোগ আছে। তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতিনির্ভর অনুষ্ঠানের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। জাতীয়ভাবে আদিবাসীদের ভাবমূর্তি গঠনের প্রয়োজনে এগুলো বাড়াতে হবে। ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে সব ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট করাও জরুরি। এখানে তাদের জীবন ও সমস্যা নিয়ে গবেষণা হবে। প্রাথমিক শিক্ষায় তাদের ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করা, তাদের শিশুদের বৃত্তি দেওয়া প্রয়োজন। আদিবাসীদের সংস্কৃতি বাংলা সংস্কৃতিকেই সমৃদ্ধ করছে। তারা আমাদের গর্বের বিষয়, বহুমুখী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বাংলাদেশের স্বার্থেই এই অবহেলার অবসান ঘটানো এখন সময়ের দাবি।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৫ শরণার্থী পূণর্বাসন:

অজস্র উদ্বাস্তু পাহাড়ি পরিবার এখনো এমন শান্তির প্রত্যাশায়

চুক্তির আগে প্রায় দুই দশক ধরে চলা সশস্ত্র সংঘাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে হাজার হাজার পরিবার উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। এসব পরিবারের একটি অংশ ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয়। তবে বড় অংশ দেশত্যাগ না করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় নিয়ে বসবাস করছে। তাদের সরকারিভাবে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে। শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে এক যুগ আগে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চুক্তিতে একটি টাস্কফোর্স গঠনের শর্ত রাখা হয়। সে অনুযায়ী, চুক্তির পরপরই ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনবিষয়ক টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। টাস্কফোর্স ভারত থেকে ফিরে আসা শরণার্থীদের পুনর্বাসনে কিছু পদক্ষেপ নিলেও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তালিকা প্রকাশ ছাড়া আর কোনো অগ্রগতি হয়নি।

অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু কারা: ১৯৯৮ সালের ৬ জুন খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত 'ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী' ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন টাস্কফোর্সের দ্বিতীয় সভায় অভ্যন্তরীণ

Dhaka University Institutional Repository

উদ্বাস্তুদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়। সেখানে বলা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা) দীর্ঘদিন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিজনিত কারণে যেসব উপজাতি নিজ গ্রাম, মৌজা, অঞ্চল ত্যাগ করে স্বদেশের মধ্যে অন্যত্র চলে গেছে বা চলে যেতে বাধ্য হয়েছে, তারা অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে বিবেচিত হবে। এ সংজ্ঞায় উদ্বাস্তু হওয়ার চার ধরনের উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

ক. স্বীয় গ্রাম থেকে অন্য কোনো গ্রামে বা নতুন কোনো গ্রাম স্থাপন করে বসবাস করছে,

খ. স্বীয় মৌজা থেকে অন্য কোনো মৌজায় চলে গেছে,

গ. যাদের সরকার কর্তৃক গুচ্ছগ্রামে যেতে বাধ্য করা হয়েছে

ঘ. স্বীয় গ্রাম থেকে অন্যত্র যাওয়ার পর যারা স্বগ্রামে বা স্বগ্রামের নিকটস্থ স্থানে ফিরে এসেছে কিন্তু স্বগ্রামে ফিরে যেতে পারেনি এবং অর্থনৈতিক দৈন্যে ভুগছে।

পরবর্তী সময়ে একই মাসের ২৭ তারিখে একই স্থানে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আবার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়–'১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৯২ সালের ১০ আগস্ট (অস্ত্র বিরতির শুরুর দিন পর্যন্ত) পার্বত্য চট্টগ্রামে (খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান) দীর্ঘ অশান্ত ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে যেসব উপজাতি নিজ গ্রাম, মৌজা, অঞ্চল ত্যাগ করে স্বদেশের মধ্যে অন্যত্র চলে গেছে বা চলে যেতে বাধ্য হয়েছে, তারা অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে বিবেচিত হবে।'

অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন: ভারত থেকে ফিরে আসা শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৯৭ সালের ৮ এপ্রিল তৎকালীন সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমাকে প্রধান করে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। একই বছরের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পার্বত্য চুক্তিতে টাস্কফোর্স গঠনের শর্ত রাখা হয়। পরে ওই চুক্তির 'ঘ' খণ্ডে ১ নম্বর ধারার শর্ত মোতাবেক তৎকালীন সাংসদ ও বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদারকে চেয়ারম্যান করে 'ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী' এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন টাস্কফোর্স পুনর্গঠন করা হয়। ওই টাস্কফোর্স ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তালিকা তৈরির কাজে হাত দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০০০ সালের ১৫ মে অনুষ্ঠিত টাস্কফোর্সের একাদশ সভায় অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের জেলাভিত্তিক পাহাড়ি ও বাঙালি পরিবারের সংখ্যা ঘোষণা করা হয়। সে অনুযায়ী, পাহাড়ি পরিবারের সংখ্যা রাঙামাটিতে ৩৫ হাজার ৫৯৫, বান্দরবানে আট হাজার ৪৩ ও খাগড়াছড়িতে ৪৬ হাজার ৫৭০ পরিবার রয়েছে এবং বাঙালি পরিবারের সংখ্যা রাঙামাটিতে ১৫ হাজার ৫১৬, খাগড়াছড়িতে ২২ হাজার ৩৭১ ও বান্দরবানে ২৬৯।

এ সময় উদ্বাস্তু পরিবারগুলোর জন্য চার দফা প্যাকেজ সুবিধাও ঘোষণা করা হয়। সেগুলো হলো, উদ্বাস্তু প্রতি পরিবারকে এককালীন ১৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৯২ সালের ১০ আগস্ট জনসংহতি সমিতি কর্তৃক অস্ত্রবিরতি ঘোষণার আগের দিন পর্যন্ত যেসব উদ্বাস্তু পরিবারের পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ রয়েছে, তা সুদসহ মওকুফ এবং পাঁচ হাজার টাকার উর্ধ্বে কৃষিঋণের সুদ মওকুফ, উদ্বাস্তুদের মালিকানাধীন জমিসংক্রান্ত বিরোধ ভূমি কমিশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা এবং আয়বর্ধন কর্মসূচির জন্য থোক বরাদ্দ প্রদান ও ওই বরাদ্দ থেকে তফসিল ব্যাংকের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদান।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ বছরের ২৩ মার্চ খাগড়াছড়ি থেকে নির্বাচিত সরকারদলীয় সাংসদ যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরাকে টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হয়। পুনর্গঠিত টাস্কফোর্সের ৫ অক্টোবর খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত সভায় ২০০০ সালের ১৫ মে উপস্থাপিত অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পরিবারগুলোর তালিকা প্রকাশ করা হয়। পরবর্তী সভায় অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পরিচিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া নির্ধারণ ও প্রকৃত অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের অন্তর্ভুক্ত করা, ২০ দফা প্যাকেজ সুবিধা, টাস্কফোর্সের নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠান, টাস্কফোর্সের মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন এবং জনবল ও তহবিল ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়।

ভারত থেকে ফিরে আসা শরণার্থীদের সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তার বিষয়ে সরকার ও শরণার্থীদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া গেছে। প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও

Dhaka University Institutional Repository

টাস্কফোর্সের সদস্য সন্তোষিত চাকমা অভিযোগ করেন, ভারত থেকে ফিরে আসার পর শরণার্থীরা সরকারের দেওয়া ২০ দফা প্যাকেজ ঘোষণা অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না। এ ছাড়া ১৯৯৯ সাল থেকে কমপক্ষে ছয়বার সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার হয়েছে শরণার্থীরা।

অপরদিকে শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা ভারত থেকে ফিরে আসা সব শরণার্থী পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে বলে দাবি করেন। কিছু কিছু জমি নিয়ে বিরোধ থাকলেও ভূমি কমিশন কাজ শুরু করলে তা ঠিক হয়ে যাবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। ১৯৯৭ সালের ৯ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের মহাপরিচালক এ এস এম মোবায়দুল ইসলাম ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সভাপতি উপেন্দ্র লাল চাকমা শরণার্থীদের দেশে ফিরে আসাসংক্রান্ত একটি চুক্তি সই করেন। পরে তা ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এ চুক্তির ভিত্তিতে ১৯৯৭ সালের ২৮ মার্চ থেকে শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন শুরু হয়। কয়েক দফায় ১২ হাজার ২২২ পরিবারে ৬৪ হাজার ৬০৯ জন শরণার্থী দেশে ফিরে আসে[৩]।

৬.৬ জাতিসংঘ গৃহীত পদক্ষেপ:

প্রত্যন্ত এলাকার আর দশজন গৃহিণীর মতোই সাদামাটা ছিল ক্রাথুই ফ্রু মারমার দিনযাপন। কখনো জুমচাষ, আবার কখনো শন কেটে দিনে কোনো রকমে দুবেলা খেয়ে কেটেছে তাঁর জীবন। গ্রামের অন্যদের সংগঠিত করে নিজেদের ভাগ্যবদল, জেলা সদরে ব্যাংকে যাওয়া, জীবিকা বদলের হাতে-কলমে শিক্ষা নেওয়া–বছর পাঁচেক আগেও এ ছিল তাঁর কল্পনার অতীত। কিন্তু তাঁদের গ্রাম জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আসার পর এসব এখন শুধু আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। রাঙামাটি থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে সদর উপজেলার জিবতলী ইউনিয়নের মারমা জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অংশাজাই কার্বারিপাড়া গ্রামটি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের আওতায় আসা কয়েক শ গ্রামের অন্যতম।

ক্রাথুই জানান, ২০০৪ সালে জাতিসংঘ গ্রামের মানুষের জীবন-জীবিকা পাল্টাতে প্রায় তিন লাখ ১৮ হাজার ৮০০ টাকা দিয়েছিল। মূলত গরু-ছাগল লালন-পালন, বাগান পরিচর্যাসহ কৃষি কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ওই টাকা দেওয়া হয়। সঙ্গে গ্রামবাসী যোগ করে তাদের জমানো প্রায় দুই লাখ টাকা। সাহায্যের টাকা থেকে দুই লাখ ৮০ হাজার টাকা দিয়ে তারা ৩৭টি গরু-বাছুর কেনে। বাকি টাকা জমা রাখে ব্যাংকে। চার বছর পর সেসব গরু বিক্রির পর লাভের অর্ধেক তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়েছে। বাকি টাকা রেখেছে ব্যাংকে। তিনি জানান, লাভের টাকা দিয়ে ১২টি পরিবারকে টিন, চারটি পরিবারকে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্র ও চারটি পরিবারকে ছাগল কিনে দেওয়া হয়েছে।

জেলা সদর থেকে আট কিলোমিটার দূরে বালুখালী ইউনিয়নের কিল্ল্যামুড়া বাঙ্গালিপাড়ার ছবিটা খানিকটা অন্য রকম। এখানকার মানুষের জীবিকা মূলত মাছ শিকার কিংবা অন্যের জমিতে চাষাবাদ। তাই বছরের একটা সময় বিশেষত শুকনো মৌসুমে হুমকির সম্মুখীন হয় এদের জীবন ও জীবিকা। তা ছাড়া জাতিসংঘের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মাত্র দুই বছর আগে আসায় এখানকার মানুষ এখনো পুরোপুরি এর সুফল পায়নি। গ্রামের অধিবাসী মোহাম্মদ আইয়ুব জানান, জাতিসংঘের প্রকল্পের আওতায় তাঁরা চার লাখ টাকা পেয়েছেন। যার মধ্যে দুই লাখ ৩০ হাজার টাকায় তাঁরা ২০টি গরু কিনেছেন। বাকি টাকা ব্যাংকে রেখেছেন। তিনি জানান, আপৎকালীন চাহিদা মেটাতে তাঁরা ম্রো জনগোষ্ঠীর প্রথা অনুসরণ করে শস্যভান্ডার (রাইস ব্যাংক) গঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন। গ্রামের প্রতিটি পরিবার নির্দিষ্ট হারে ধান-চাল শস্যভান্ডারে মজুদ করবে এবং প্রয়োজনের সময় টাকা দিয়ে শস্য কিনে নেবে। তাঁর মতে, আগামী বছর থেকে শস্যভান্ডার চালু হলে গ্রামের মানুষের খাদ্যাভাব অনেকটা দূর হবে। জাতিসংঘের প্রকল্প চালুর পর গ্রামের অধিকাংশ মানুষের জীবন পরিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেছে বলে তারা মনে করে।

চুক্তি সইয়ের পর তিন পার্বত্য জেলার আদিবাসী ও বাঙালি জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি ২০০৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন-সুবিধা (সিএইচটিডিএফ) শীর্ষক প্রায় ৩০০ কোটি টাকার একটি উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়। প্রকল্পের প্রথম পর্যায় ২০০৯ সালে শেষ হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন প্রায় এক হাজার ১০০ কোটি টাকায় বাড়িয়ে এর মেয়াদ ২০১৩ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের ২৫টি উপজেলায় ১৬টিতে প্রকল্পের কাজ চলছে। আর এর সুফল ভোগ করছে এ অঞ্চলের পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষ। আত্মনির্ভরশীলতা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার নীতিকে বিবেচনায় নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নে এ কর্মসূচি হাতে নেয় জাতিসংঘ। বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তি সইয়ের মাধ্যমে জাতিসংঘ উন্নয়ন প্রকল্পটি পরিচালনা করছে। প্রকল্পে আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে ইউরোপিয়ান কমিশন, কানাডিয়ান সাহায্য সংস্থা সিডা, মার্কিন সাহায্য সংস্থা ইউএসএইড, ড্যানিশ সাহায্য সংস্থা ডানিডা, অস্ট্রেলিয়ান সাহায্য সংস্থা অস্‌এইড এবং নরওয়ে ও জাপান [৭]।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৭ সাংবিধানিক স্বীকৃতির প্রয়োজন:

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর যে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা হয় তাতে আদিবাসীদের স্বীকৃতির বিষয়টি উপেক্ষিত করা হয়। সম্প্রতি জাতীয় সংসদেও ডেপুটি স্পিকার শওকত আলী সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৫৪ তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, " ৭২ এর সংবিধানে আদিবাসীদের কোনো স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। সরকার যদি সেই সংবিধানে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তবে সেখানে জাতীয়তার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ধারায় পরিবর্তন আনা হবে" (৩০জুন, দৈনিক প্রথম আলো)। মাননীয় ডেপুটি স্পিকারের এ ধরনের উপলোব্ধী ও বক্তব্য আদিবাসীদে জন্য অবশ্যই যুক্তিযুক্ত ও সময়োপযোগী। তার এই বক্তব্যের মাধ্যমে আদিবাসীরা নতুন করে আশার আলো দেখতে পাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা (এম এন লারমা) আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়টি ৭২ সালের সংবিধান প্রনয়নের সময়ই উপলোব্ধী করতে পেরেছিলেন। সেই সময় তিনি গণপরিষদের অধিবেশনেও এ বিষয়ে অর্থাৎ সাংবিধানিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে দাবিও তুলেছিলেন। খসরা সংবিধানের উপর যখন গণপরিষদে আলাপ আলোচনা চলছিল তখন তিনি ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর পাশাপাশি নারী, কৃষক, শ্রমীক ও মেহনতি মানুষের অধিকারের কথাও সংবিধানে অন্তর্ভূক্তির দাবী জানিয়েছিলেন। কিন্তু সে সময়ে তার সে দাবী গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সংধিানের ১৪ নং অনুচ্ছেদে জাতিসত্তাগুলোর অধিকারের কথা উল্লেখ করে মানবেন্দ্র লারমা বলেন,"আমরা করুনার পাত্র হিসেবে আসিনি। আমরা এসেছি মানুষ হিসেবে। তাই আমাদেরও মানুষ হিসেবে বাঁচার অধিকার আছে"[৮]।

মানবেনাদ্র নারায়ন লারমা চেয়েছিলেন স্বাধীন দেশের স্বাধীন গণপরিষদের অধিবেশনে আদিবাসীদের অধিকারের নিশ্চয়তা। ৭২ সালের ৩১ অক্টোবর সংবিধানের ৬ নং অনুচ্ছেদের 'নাগরিকত্বের ওপর সংশোধনী প্রস্তাবে' আলোচনা করতে গিয়ে তিনি নাগরিকত্বের সংজ্ঞা বিবেচনা করার দাবি করেছিলেন। কারন তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যদি এই ধারা পাস হয় তবে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর অস্তিত্ব লোভ পাবে। কিন্তু তার সে দাবিকে উপেক্ষা করেই সেদিন সংবিধানের এই অনুচ্ছেদ পাস হয়ে যায়। এর প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি অনির্দিষ্টকালের জন্য গণপরিষদের অধিবেশন বর্জন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

একটি উপজাতি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা নিজেদের স্বাধীনতার, স্বায়ত্বশাসনের কথা বেবেছিল। কিন্তু একটি উপজাতি হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার চেয়ে একটি জাতি হিসেবে স্বাধীনতা লাভ করা অনেক বেশি সম্মানজনক। সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গীও যুক্তিসঙ্গত। কারণ আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। তবে বাস্তবে বাংলাদেশের বাঙালী নাগরিকদের মতো সবাই সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেনা।

৭২ সালের সংবিধানকে অনেকেই অসাম্প্রদায়িক একটি সংবিধান হিসেবে ব্যাখ্যা করলেও রাশেদ খান মেনন এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

৬.৮ সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার:

আসিফ নজরুল মনে করেন, দুর্যোগ বা যুদ্ধকালীন অবস্থা বাদে বাংলাদেশের যেকোনো অঞ্চলে সেনা মোতায়েন ঠিক না। তবে পার্বত্য অঞ্চল 'যেকোনো অঞ্চল' নয়। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে দুর্গম একটি এলাকা। মিয়ানমারের আরাকান এবং ভারতের ত্রিপুরা ও মিজোরামের সঙ্গে এর সীমানা রয়েছে বলে এর রাজনৈতিক গুরুত্ব আরও অনেক বেশি। অনুন্নত বিশ্বে এ ধরনের যেকোনো অঞ্চলে মাদক ও অস্ত্র ব্যবসায়ী, ভাড়াটে সেনা, বিদ্রোহী, উগ্রবাদী এবং দেশি-বিদেশি বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপগুলোর যাতায়াত ও অবস্থান থাকে বেশি। পার্বত্য চট্টগ্রামও এর ব্যতিক্রম নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক সংখ্যক সেনা মোতায়েনের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল, এখানকার শান্তি বাহিনীর বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। ১৯৭২-এর সংবিধানে পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র জাতিগুলোকে কোনো স্বীকৃতি না দিয়ে যে ভুলের সূচনা করা হয়েছিল, তা পরবর্তী সরকারগুলোর বিতর্কিত বা ভ্রান্ত নীতির কারণে গভীর সংকটে রূপান্তরিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী সেনানিবাস এবং অস্থায়ী সেনাক্যাম্পের বিস্তৃতি সে কারণে একসময় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

১৯৯৭ সালের পার্বত্য চুক্তির আলোচনাকালে সেনা প্রত্যাহারের বিষয়টি বিবেচনায় আনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। চুক্তির ১৯ (ঘ) নং অনুচ্ছেদে শান্তি বাহিনীর সদস্যদের আত্মসমর্পণের পর এখান থেকে সামরিক বাহিনী, হিল আনসার ও ভিলেজ ডিফেন্স পার্টির সব অস্থায়ী ক্যাম্প গুটিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়। চুক্তি সম্পাদনের পর শান্তি বাহিনীর অনেকে আত্মসমর্পণ করেছে, অনেকে করেনি। কিছু পত্রিকায় এমন

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবেদনও ছাপা হয়, ভারতে প্রশিক্ষণ নেওয়া শান্তি বাহিনীর প্রায় ১০ হাজার সদস্যের মধ্যে আত্মসমর্পণকারীর সংখ্যা অর্ধেকের কম। যারা আত্মসমর্পণ করেনি তারা অন্তত নগণ্য নয়, নিশ্চুপও নয়। ইউপিডিএফ নামের সংগঠনের ব্যানারে প্রকাশ্যে এখনো চুক্তির বিরোধিতা করে চলেছে এরা। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙালী তো বটেই, চুক্তি সম্পাদনকারী আদিবাসীরাও তাদের হামলার শিকার হয়েছে মাঝেমধ্যে। বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকাগুলো থেকে সব অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হলে সবচেয়ে লাভবান ও শক্তিশালী হবে এরাই। লাভবান হবে রাজনৈতিক পরিচয়ের ছত্রচ্ছায়ায় থাকা বাঙালি ও পাহাড়িদের বিভিন্ন মাফিয়া ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীও।

দুর্গম এলাকার আর কোনো অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারের আগে সরকারের তাই এ অঞ্চলের মানুষের নিরাপত্তার দিকটি নিশ্চিত করতে হবে। প্রথম পর্যায়ের প্রত্যাহারের পর বড় ধরনের কোনো নিরাপত্তাহানির ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু এটি সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে এলাকার মানুষও সেখান থেকে ভয়ে সরে পড়ার কারণে কি না তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। বড় ধরনের দুর্ঘটনা এখনো ঘটেনি বলে পুরোপুরি প্রত্যাহারের পরও তা ঘটবে না, এটিও স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেওয়ার কোনো কারণ নেই। কারও মনে কুমতলব থাকলে পুরোপুরি প্রত্যাহারের অপেক্ষাই বরং করবে তারা।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা প্রত্যাহারের কারণে শুধু যে বাঙালীরা বিপদে পড়তে পারে তা নয়, বিপদ হতে পারে শান্তিপ্রিয় পাহাড়ি বা আদিবাসীদেরও। অতীতে সশস্ত্র গ্রুপগুলো কর্তৃক এসব আদিবাসীর কাছ থেকে জোর করে চাঁদা আদায়ের অনেক ঘটনা ঘটেছে। দুর্গম এলাকার বাসিন্দা হিসেবে সেনা প্রত্যাহারের পর এ ধরনের গ্রুপগুলোর প্রথম টার্গেট এদেরই হওয়ার কথা। এদের নিরাপত্তার দিকটি অবশ্যই সরকারকে বিবেচনায় আনতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্থায়ী সেনাক্যাম্প তাই বলে চিরতরে অব্যাহত রাখা উচিত নয়। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা অতীতে সেখানে পাহাড়ীদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছেন এমন অভিযোগ আছে। তাঁদের অবস্থানের সুযোগে এবং প্রশাসনের ছত্রচ্ছায়ায় বাঙালি কর্তৃক পাহাড়ীদের ভূমিগ্রাসের অনেক ঘটনা ঘটেছে। বাঙালী জনগোষ্ঠীর বিপুল সংখ্যাধিক্যের সেনাবাহিনীর সঙ্গে পাহাড়ীদের বসবাসের মনস্তাত্ত্বিক আতঙ্কও রয়েছে সেখানে। খুবই কৌশলগত কিছু এলাকা বাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে তাই অস্থায়ী

Dhaka University Institutional Repository

সেনাক্যাম্পের অধিকাংশই প্রত্যাহার করা উচিত। তবে তার আগে অবশ্যই এলাকার মানুষের নিরাপত্তা ঝুঁকি রোধে শক্তিশালী কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। একটি বিকল্প হতে পারে এলাকার ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি, আর্মড পুলিশ, হিল আনসার, বিডিআরের সমন্বয়ে একটি যৌথ কমান্ডের অধীনে বিশেষ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী গঠন। এই বাহিনীকে যথেষ্ট ট্রেনিং এবং সরঞ্জাম প্রদান করতে হবে, এতে পাহাড়ীদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব রাখতে হবে। সু-উন্নত তদারকি ব্যবস্থার মাধ্যমে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, এই বাহিনী কারও প্রতি কোনো অন্যায় বা বৈষম্যমূলক আচরণ করছে না, বা কোনো জনগোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে নাক গলাচ্ছে না।

এ ধরনের একটি বাহিনী পার্বত্য অঞ্চলে তখনই সফল হতে পারবে, যদি পাহাড়ীদের ভূমি ও জীবিকার ওপর আঘাত চিরতরে প্রতিরোধ করা যায়। চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি, শরণার্থী পুনর্বাসন টাস্কফোর্স, পার্বত্য জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন ঠিকমতো কাজ করতে পারলে তা করা সম্ভব। সেনা প্রত্যাহারের সঙ্গে সমন্বিতভাবে এসব উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে এ নিয়ে মানুষের আতঙ্কও বহুলাংশে কমে যাওয়ার কথা। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পার্বত্য অঞ্চল পাহাড়ীদেরও, বাঙালীদেরও।বাঙালী জনগোষ্ঠীর ন্যায়সংগত অধিকার রক্ষা করেও সেখানে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী হিসেবে পাহাড়ীদের নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব। চুক্তির মধ্যে সেই সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে চুক্তিতে সংবিধানবিরোধী কিছু বিধানও রয়েছে। যেমন–চুক্তিতে পার্বত্য এলাকায় আলাদা ভোটার তালিকা বা শুধু ভূমি-মালিকদের ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এসব বিধান পুনর্বিবেচনা এবং বাতিলের লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে মতৈক্য সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া উচিত। অবশিষ্ট বিদ্রোহীদের চুক্তির আওতায় নিয়ে আসার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের উদ্যোগও গ্রহণ করা উচিত। বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করা কেন জরুরি–এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হয়। আমার ধারণা, বাংলাদেশে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের বেগ পেতে হয় তখনই, যখন আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে দূরে সরে আসি। আর তাই দিকনির্দেশনা পেতে আমরা এদিক-ওদিক ঘুরেফিরে মরি এবং সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে থাকি। বিস্তারিত বিবরণে না গিয়ে একথা বলা চলে যে পরবর্তী সময়ে নানাভাবে,

Dhaka University Institutional Repository

নানা কারণে মানুষের সেই প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষার অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব রূপায়ণ ঘটেনি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠী যে গভীর এক বঞ্চনার বোধ থেকে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল, সেটাও এক ঐতিহাসিক সত্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামের এর পরের ইতিহাস এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ইতিহাস। সে অঞ্চলের আদিবাসীরা নানা কারণে নিয়মতান্ত্রিক পথ পরিহার করে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বেছে নেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের পক্ষ থেকে চালানো হয় সেনাবাহিনীর অভিযান। যা-ই হোক, ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকা আন্দোলন, সংগ্রাম ও সহিংসতার পর তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের পক্ষে জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হয়। সশস্ত্র আন্দোলনের ইতিহাসে এটাও একটি বিরল ঘটনা। এ চুক্তি সম্পর্কে রূপায়ণ দেওয়ান তাঁর 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া' প্রবন্ধে এই চুক্তি বাস্তবায়নে ধীর প্রক্রিয়া ও নানা সময়ে নানা রাজনৈতিক শক্তির অনীহার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন ঠিকই, তার পরও তিনি লিখেছেন, 'এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা দেশের মানুষ ও আন্তর্জাতিক মহল স্বস্তি লাভ করে। শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রত্যাশায় আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে সবাই। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা, ব্যক্তিত্ব ও আন্তর্জাতিক মহল এ চুক্তিকে স্বাগত জানায়। ইউনেসকো সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হুপে ফেলিক্স বোয়নি পুরস্কারে ভূষিত করে।'

চুক্তির মোট ১৯টি ধারায় নানা শর্ত বিধৃত করা হয়। এর মধ্যে ১৭ ধারার ক এবং খ উপধারায় সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীসংক্রান্ত সমঝোতা তুলে ধরা হয়।

চুক্তির ১৭-এর ক উপধারা অনুযায়ী: "সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আনার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলীকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃঙ্খলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনা

Dhaka University Institutional Repository

বাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।'

উপধারা খ অনুযায়ী: 'সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।' এ চুক্তি শুধু দেশি-বিদেশি, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ও তদানীন্তন সরকারের অভ্যন্তরের মানুষ বা প্রতিষ্ঠান নয়, যাঁরাই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে দেখতে চেয়েছেন, সবার সমর্থন পেয়েছে। আর এ সমর্থন দেওয়া হয়েছে চুক্তির অন্তর্গত সব শর্তকে, যার ১৭ নম্বরে স্পষ্ট ভাষায় পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অস্থায়ী সেনাক্যাম্প অপসারণের কথা বলা হয়েছে।

অন্য কোনো প্রসঙ্গে না গিয়েও সরাসরি এ কথা বলা যায় যে চুক্তির শর্ত অনুযায়ীই একটি নির্দিষ্ট সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সব অস্থায়ী ক্যাম্প পর্যায়ক্রমে ফেরত নেওয়ার কথা এবং যদি সে রকম প্রয়োজন দেখা দেয়, দেশের অন্যান্য স্থানে যে নিয়মে সেনাবাহিনী তলব করা হয়, ঠিক সেই নিয়মই পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য প্রযোজ্য হওয়ার কথা। এ ছাড়া আঞ্চলিক পরিষদেরও এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা নির্দিষ্ট করা আছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ঘটেনি। অর্থাৎ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার এক যুগ পূর্তির পরও পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্পগুলো বহাল রয়েছে এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে নানা সময়ে সারা দেশ যেভাবে সেনাবাহিনীর শাসনে ছিল, পার্বত্য চট্টগ্রাম এখনো তার চেয়েও বেশি সেনাশাসনের অধীন। এ কথাও আমাদের জানা নেই যে আঞ্চলিক পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল কি না।

দেখতে হবে পার্বত্য চট্টগ্রামের অভিজ্ঞতা কী বলে। ২০০৩ সালে মহালছড়ির ২৪টি গ্রাম যখন আগুনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেখানে তথ্য অনুসন্ধানের কাজে গিয়ে প্রতি পদে সেনাবাহিনীর সদস্যদের নজরদারির মধ্যে থাকতে হয়েছে। সেনাক্যাম্প থেকে সরাসরি বাড়িঘরগুলোর ওপর দূরবীন দিয়ে দৃষ্টি রাখা হচ্ছিল। দীঘিনালা, সাজেক–যেকোনো জায়গায় যেতে হলেই সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকতে হয়। এমন কোনো

Dhaka University Institutional Repository

সময়ের কথা মনে করতে পারি না যখন পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাগুলোয় ঢুকতে গেলে সেনাসদস্যদের কাছে পরিচয় দিতে হয়নি।

449998

লক্ষ করার বিষয় হলো, তার পরও দিনের পর দিন হত্যা, অগ্নিসংযোগ, অপহরণ ঘটতেই থাকে। এমনকি খোদ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধেই পার্বত্য চট্টগ্রামে গণহত্যা চালানো বা গণহত্যায় মদদ জোগানোর শক্ত অভিযোগ ওঠে। ২৯ মে ২০০৪ সালের প্রথম আলোয় মুহাম্মাদ আমীরুল হক লিখেছেন 'সেই সঙ্গে রয়েছে বহু সংখ্যক পাহাড়ি উপজাতীয় নারী ধর্ষণ এবং তাদের ধর্মীয় স্থান অপবিত্রকরণ, সম্পত্তি দখল ইত্যাদি অভিযোগ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯৮০ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৯৯৩ সালের ৭ নভেম্বর পর্যন্ত ১৩টি গণহত্যা সংঘটিত হয়। উল্লেখযোগ্যগুলো হচ্ছে, কাউখালী কলামুতি গণহত্যা, বানরাইবারি, বেলতলী বেলছড়ি গণহত্যা, (২৬ জুন ১৯৮১) তেলাকাং, আশালং তবলছড়ি গণহত্যা, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ লোদাং গণহত্যা ১০ এপ্রিল ১৯৯২ ইত্যাদি। এ ছাড়া ১৭ নভেম্বর ১৯৯২ ঘটে ন্যক্কারজনক নানিয়ারচর গণহত্যা।' এসব মূলত ঘটেছে রাজনৈতিক বিবেচনায়–যে রাজনীতি চালিত হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আদিবাসী অধ্যুষিত স্থানের বিশেষ অবস্থান থেকে অন্য রকম এক ভূমিতে রূপান্তর করার স্বার্থে। এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে কিছু সুবিধাভোগীর অর্থনৈতিক স্বার্থ। ভূমি ও বন দখলকারী শক্তি ক্রমশ গেড়ে বসেছে ওই অঞ্চলে বিশেষ সাহায্যপুষ্ট গোষ্ঠী হিসেবে। আদিবাসী সংস্কৃতির ওপর বাইরের সংস্কৃতি ক্রমাগত আগ্রাসন চালিয়ে আদিবাসী বৈচিত্র্যকে ম্লান করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এখানে সহযোগী ভূমিকা পালন করেছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় মৌলবাদী শক্তির উত্থান। সংস্কৃতির আরেকটি দিকও আলোচনার গুরুত্ব রাখে, তা হলো, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ও সেনাসদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক, যা ক্রমান্বয়ে বৈরী রূপ ধারণ করতে থাকে। এর একটা বিশেষ আঙ্গিকও রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ও বাঙালি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে মতবিনিময় করার সময় স্পষ্ট দেখা গেছে যে আদিবাসীরা মনে করে, সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাদের প্রতি বন্ধুসুলভ নন। পক্ষান্তরে বাঙালিরা মনে করে, সেনাবাহিনী ওই অঞ্চলে তাদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে। এটা আদিবাসী-বাঙালি সম্পর্কের মধ্যেও একটা অবাঞ্ছিত প্রভাব ফেলছে। সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তির জন্যও এটা ক্ষতিকর। সেনাবাহিনী একটি দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ এবং তারা বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত হয় বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের সঙ্গে আলোচনায় পার্বত্য চট্টগ্রামস্থ সেনা কর্তৃপক্ষও এ কথা বলেছে যে এ মুহূর্তে সেখান থেকে অস্থায়ী ক্যাম্পগুলো সরিয়ে নিলে কোনো সমস্যা হবে না। সেখান থেকে তাদের সরিয়ে এনে দীর্ঘ সময় ভিন্ন ভূমিকায় নিয়োজিত রেখে তাদের পেশাদারির ওপরও ন্যায়বিচার করা হচ্ছে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মানুষ সেই পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক সময় থেকে নিজেদের জন্য একটা গণতান্ত্রিক সমাজ কামনা করে আসছে। কতভাবে, কত পথে, কত ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে জাঁদরেল পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ, প্রতিরোধ আন্দোলন করে ১৯৭০ সালের নির্বাচন আদায় করেছে। ২৫ মার্চের গণহত্যার প্রত্যুত্তরে নিরস্ত্র জনগণ অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে হানাদার বাহিনীর হাত থেকে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। ভয়ঙ্কর হত্যাযজ্ঞ, নিপীড়ন, লাঞ্ছনা আর প্রিয়জন হারানোর কষ্টের পাথার পেরিয়ে ভয়াবহ নয়টি মাস পরম ধৈর্যে এমন একটি দেশের জন্য কাজ করে গেছে, যেখানে আর তাদের মাথার ওপর অস্ত্রের ঝনঝনানি থাকবে না। সরকার চালিত হবে ব্যালটের জোরে, বুলেটের নয়। মানুষ জীবন চালাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের, স্বাধিকারের ভিত্তিতে, অন্য কিছুর নয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথাটা সেখানেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

এ কথা ঠিক, একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজনে সরকারের দ্বারা আদিষ্ট হয়েই সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। যে উদ্দেশ্যে সেটা করা হয়েছিল, তা হলো ওই অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করা। আজকে সেই শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্যই পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্প তুলে নেওয়া জরুরি। আর সে কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মধ্যে এই বিষয়টি এত গুরুত্বসহকারে সন্নিবেশিত হয়েছিল। এটি কোনো সামরিক বিবেচনার বিষয় নয় বরং রাজনৈতিক। আজকে আমরা অত্যন্ত আশাবাদী হয়ে অপেক্ষা করে আছি যে এই সরকার অযথা কালবিলম্ব না করে চুক্তি মোতাবেক অন্য ১৬টি শর্তের সঙ্গে সঙ্গে ছয়টি স্থায়ী-অস্থায়ী ক্যাম্প ফেরত নিয়ে যাবে। যার আংশিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে আমরা দেখতে পাই। আমরা অপেক্ষা করে আছি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করার জন্য, যা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে স্পষ্ট করে উল্লিখিত হয়েছে।

৬.৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি:

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীসমূহ তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা ও সংস্কৃতিকে ধরে রাখার জন্য "ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদ" প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দীর্ঘ দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে যে সংগ্রাম করে আসছে তারই সফল বাস্তবায়ন পার্বত্য শান্তিচুক্তি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সরকারের প্রতি তাদের আস্থাহীনতার কারণে সৃষ্ট ইন্সার্জেন্সি এবং তার বিপরীত কাউন্টার ইন্সার্জেন্সির ফলে পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ওঠে। এই অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনতে প্রত্যেক সরকার তার সাধ্যমত চেষ্টা করে এসেছে। জিয়াউর রহমান সরকার, এরশাদ সরকার ও খালেদা জিয়া সরকার উপজাতীয় নেতৃত্বের সাথে তথা জনসংহতি সমিতির সাথে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে আলোচনায় বসেছেন। লক্ষ্য একটি–শান্তি। ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন নির্বাচনে জয়ী হয়ে শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতা গ্রহনের পর পরই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে পূর্ববর্তী সরকার সমূহের পদাঙ্ক অনুস্মরণ করে জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনায় বসেন। শেখ হাসিনা সরকারের গঠিত জাতীয় কমিটির সাথে জনসংহতি সমিতির সাত দফা বৈঠকের সফল সমাপ্তি ঘটে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭।

৬.১০। ১৯৭১ থেকে ১৯৯৭: বিভিন্ন সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ সমূহ:

৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন তাকে উপজাতীয় সমাজ সুন্দরভাবে মেনে না নিয়ে বরং ইন্সার্জেন্সি শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্রমাবনতিশীল পরিস্থিতিতে তৎকালীন সরকার অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটিকে গভীরভাবে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়নের চেষ্টা করেন। তৎসময়ে সহিংস তৎপরতা দমনে জিয়া সরকার সামরিক পদক্ষেপ গ্রহনের পাশাপাশি একটি মধ্যপন্থি উপজাতীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৭৭ সালের জুলাই মাসে "ট্রাইবাল কনভেনসন" গঠন করেন। শান্তি বাহিনীকে সহিংস পথ থেকে আলোচনার পথে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব দেওয়া হয় এই ট্রাইবাল কনভেনসনকে। তাছাড়া জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালের ১লা জানুয়ারি "অধ্যাদেশ নং ৭৭" অনুযায়ী "পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড" গঠন করেন। লক্ষ্য ছিল পাহাড়ীদের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনা। এছাড়াও ৭৭ সালে গঠন করা হয় "উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনিস্টিটিউট"। উপজাতীয় ইন্সার্জেন্সি বন্ধ করা এবং তাদের সাথে সংলাপের পথ উন্মুক্ত করার জন্য প্রথমে চাকমা রাজমাতা বিনীতা রায়কে উপদেষ্টা নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু দূর্ভাগ্য হলেও সত্য তিনি পার্বত্য অসন্তোষ দমনে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে মোমাং রাজ পরিবারের সদস্য অং শৈ প্রু চৌধুরীকে উপদেষ্টা ও সুবিমল দেওয়ানকে সহকারী উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করেও পার্বত্য পরিস্থিতির স্থায়ী কোনো সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায়নি। ১৯৮০ সালের ১৮ মে রাঙামাটিতে পেসিডেন্ট জিয়ার সঙ্গে ট্রাইবাল কনভেনসনের নেতৃবৃন্দের একটি বৈঠক হয়। তারা ঐ বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রামের

Dhaka University Institutional Repository

স্বায়ত্বশাসন এবং পার্বত্য এলাকায় অ-উপজাতীয়দেও পূণর্বাসন বন্ধের দাবি জানালে বৈঠকটি ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়।

জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর ট্রাইবাল কনভেনসন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেও ৮৩ সালে তৎকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদ তা পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নেন। এই লক্ষ্যে তিনি ৮৩ সালের ৩ অক্টোবর তিন পার্বত্য জেলা সফর করেন এবং ৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পার্বত্য এলাকায় সশস্ত্র আন্দোলনকারীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষনা করেন। এরই ফলশ্রুতিতে ৯ অক্টোবর ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসির সাথে ট্রাইবাল কনভেনসন রাঙামাটি জেলা কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে ক্রমান্বয়ে ট্রাইবাল কনভেনসনের নেতৃবৃন্দের সাথে সরকারের বৈঠক হতে থাকে। পার্বত্য এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঐসব বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ সরকার দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকায় কারণে চট্টগ্রাম সমস্যার প্রতি অধিক সময় ও মনযোগ দুইই দিতে পারেন। পূর্ববর্তী সরকারগুলোর সাফল্য ও ব্যর্থতার আলোকে তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো এলাকাটি মিডিয়ার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া। এরপর থেকেই বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর লোকজন সেখানে ভ্রমন শুরু করেন। এরশাদ সরকার ৮৫ অগাস্ট মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা হিসেবে ঘোষনা করে। এ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ হলোঃ

১) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কর মওকুফ;

২) ক্যাপিটাল মেশিনারেজ ও যন্ত্রাংশের আমদানি ফি থেকে অব্যহতি;

৩) প্রকল্পের ক্ষেত্রে মাত্র ৫% সুদের বিধান;

৪) বিদ্যুৎ ও গ্যাস রেট হ্রাসকরণ;

৫) ব্যাংক ঋনের সুদ ৫% হ্রাসকরণ;

৬) পাহাড়ী ও বাঙালীদের যৌথ উদ্যোগকে উৎসাহীতকরণ।

৭) বার বছরের জন্য ট্যাক্স হলিডে; এবং

৮) সকল প্রদর্শনী কেন্দ্রের প্রমোদ কর পরিহারকরণ।

Dhaka University Institutional Repository

শুধু তাই নয় নয় কর্মসংস্থান, উচ্চশিক্ষা এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এরশাদ সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।যেমন–

১) সকল সরকারী চাকরিতে পাহাড়ীদের জন্য ৫% কোটা সংরক্ষিত রাখা হয়।

২) পার্বত্য চট্টগ্রামের বেকার পাহাড়ী যুবক যুবতীদের দ্রুত পূণর্বাসনের লক্ষ্যে সরকার প্রথম পর্যায়ে সংস্থাপন মন্ত্রনালয়ের স্মারক নং সম(এডি-২)-২৯/৮৭-০৯(১৯), তাং ০৪/০১/৮৮ ইং এর মাধ্যমে ৬০০টি পদ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে একই মন্ত্রনালয়ের স্মারক নং সম(এড-২)-২৯/৮৭-৭০; তাং ০৬/০২/৮৮ ইং এর মাধ্যমে ১২৭৭ টি পদসহ দুপর্যায়ে মোট ১৮৭৭ টি পদ সনাক্ত করে পাহাড়ী প্রার্থীদের মধ্য হতে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যা উপরোক্ত ৫% কোটা বহির্ভূত।

৩) এছাড়াও ১৯৮৪/৮৫ সালে ৪৫০/৫০০ জন পাহাড়ী বেকার যুবক/যুবতীকে চাকরীতে পূণর্বাসন করা হয়েছে।

৪) যে সকল ক্ষেত্রে শারিরীক কঠোর পরিশ্রম করতে হয় সেসকল ক্ষেত্রে নিয়োগের বেলায় সরকার উপজাতীদের বয়সসীমা ৫ বছর পর্যন্ত শিথিল করেছেন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বয়স ১০ বছর পর্যন্ত শিথিল করেছেন।

৫) শিক্ষকতা এবং কারিগরি পেশা ব্যতীত সকল প্রকার চাকরীর ক্ষেত্রে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা একধাপ নিম্নে নির্ধারণ করেছেন অর্থ্যাৎ স্নাতক ডিগ্রির ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পাস ইত্যাদি।

৬) উপজাতীয় প্রার্থীদের বাছাইয়ের জন্য পৃথক দুটি বোর্ডও গঠন করা হয়। ক্যাডার বহির্ভূত প্রথম শ্রেণীর পদও এই বোর্ডের অধীনে রাখা হয়।

৭) এছাড়া নিয়োগের ক্ষেত্রে সময় সময় যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়, উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে সেসব বিধিনিষেধ কার্যকর না করার বিধান করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৮) উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের জন্য নিম্নরূপ আসন সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (১২ টি); প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়/মহাবিদ্যালয় (৬ টি); কারিগরি বিদ্যালয় (৩০ টি); কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষি কলেজ (৬ টি); রাঙামাটি প্যারা-মেডিক্যাল স্কুল (২০ টি); ক্যাডেট কলেজ (৬ টি)। মোট ৮০ টি আসন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তির জন্য সাধারণ ছাত্রছাত্রীদেও ৪৫% হতে ৬৫% নম্বরের প্রয়োজন হলেও পাহাড়ী ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাত্র ৪০% নম্বরের বিধান রাখা হয়।

উপজাতীয়দের জীবন ধারার উন্নয়নের পাশাপাশি উক্ত এলাকায় ইমার্জেন্সি এবং কাউন্টার ইমার্জেন্সি বন্ধের লক্ষ্যে উক্ত এলাকার সমস্যা রাজনৈতিক সমস্যা বলে উল্লেখ করেন এবং তারই পথ ধরে এরশাদ সরকার রাজনৈতিক সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই উদ্যোগের অংশ হচ্ছে ১৯৮২ সালে জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনার জন্য উপেন্দ্র লাল চাকমার নেতৃত্বে একটি লিয়াজোঁ কমিটি গঠন। অবশ্য তা ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয় যখন ৮৩ সালের ১০ নভেম্বর মানবেন্দ্র নারায়ন লারমাকে হত্যা করা হয়।

১৯৮৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর এরশাদ সরকারের সাথে তথা এ. কে. খন্দকারের নেতৃত্বে ৬ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় কমিটি জনসংহতি সমিতির দ্বিতীয় দফা বৈঠকে জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম তাদের ৫ দফা দাবিনামা আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করা হয়। দাবিগুলো নিচে তুলে ধরা হলো

১.

ক) পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রাদেশিক মর্যাদা প্রদান।

খ) নিজস্ব আইন পরিষদ সংবলিত প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রদান।

গ) প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হবে এবং প্রদেশ তালিকাভূক্ত বিষয়ে এই প্রাদেশিক আইন পরিষদ প্রয়োজনীয় আইন প্রনয়নের অধিকারী হবে।

ঘ) দেশরক্ষা, বৈদেশিক মুদ্রা ও ভারি শিল্প ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বনজ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, মৎস, অর্থ, পশুপালন, ব্যবসা-বানিজ্য, ক্ষুদ্র শিল্প, বেতার ও টেলিভিশন, রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ও পরিবহন, ডাক, কর ও খাজনা, জমি ক্রয়-বিক্রয় ও বন্দোবস্তি,

Dhaka University Institutional Repository

আইন-শৃঙ্খলা, বিচার, খনিজ, তেল ও গ্যাস, সংস্কৃতি, পর্যটন, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন, সমবায়, সংবাদপত্র পুস্তক ও প্রেস, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, সীমান্ত রক্ষা, সামাজিক প্রথা ও অভ্যাস, উন্নয়ন মূলক কার্যক্রমসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্য সকল বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারকে প্রত্যক্ষ প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করা।

ঙ) আইন প্রনয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও প্রদেশ যাতে নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য কেন্দ্র ও প্রদেশের ক্ষমতা স্বতন্ত্রভাবে তালিকাভূক্ত করা।

চ) পার্বত্য চট্টগ্রামের নাম পরিবর্তন করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে "জুমল্যান্ড" নামে পরিচিত করা।

ছ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তন করা।

২.

ক) গণভোটের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মতামত যাচাই করা ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে কোনো শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যাতে না হয়, সেরকম শাসনতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

খ) বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে কেউ যেন চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন, ভূমি ক্রয় বা বন্দোবস্তি নিতে না পারে সেরকম শাসনতান্ত্রিক বিধি প্রণয়ন করা।

গ) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নয় এরকম কোনো ব্যক্তি যাতে বিনা অনুমতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য শাসনতান্ত্রিক বিধি প্রণয়ন করা।

ঘ) আভ্যন্তরীন গোলযোগের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত বাংলাদেশের অপরাপর অংশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বিপদগ্রস্ত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে যেন জরুরী অবস্থা অথবা সামরিক শাসন জারি করা না হয়, সেনকম শাসনতান্ত্রিক বিধি প্রণয়ন করা।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ) প্রাদেশিক সরকারের সকল সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী নন, এমন কোনো ব্যক্তিকে যেন নিয়োগ করা না হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত কর্মকর্তাকে প্রাদেশিক সরকারের সুপারিশ ব্যতীত অন্যত্র যেন বদলী করা না হয়, সেরকম শাসনতান্ত্রিক বিধি প্রণয়ন করা।

৩.

ক.(১) ১৭ অগাস্ট ৪৭ সালের পর থেকে যারা বে-আইনীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করে পাহাড় বা সমভূমি ক্রয়, বন্দোবস্তী বা বেদখল করেছে অথবা বসতি স্থাপন করেছে সে সকল বে-আইনী বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে নেওয়া।

(২) এ দাবিনামা উত্থাপনের পর বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তিপত্র সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত যেসব 'বে-আইনী অনুপ্রবেশকারী' পার্বত্য চট্টগ্রামে জমি ক্রয়, বন্দোবস্তী বা বেদখল করে বসতি স্থাপন করবে তাদেরকে সরিয়ে দিতে হবে।

খ) পাকিস্তান আমলের শুরু থেকে বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তিপত্র সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে যেসব অধিবাসী ভারত বা বার্মায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছে তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পূনর্বাসিত করা।

গ) কাপ্তাই বাঁধের জলসীমা সর্বোচ্চ ষাট ফুট নির্ধারিত করা এবং এ বাঁধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠভাবে পূনর্বাসিত করা।

ঘ.

(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে যদি কোনো প্রকারের মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট ও হুলিয়া থাকে অথবা কারও অনুপস্থিতিতে কোনো বিচার নিষ্পত্তি হয়ে থাকে তাহলে বিনাশর্তে সেসব মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট ও হুলিয়া প্রত্যাহার ও বিচারের রায় বাতিল করা এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

Dhaka University Institutional Repository

(২) পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতির সকল সদস্যদের যথাযথ পূনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতির কাজের সাথে যুক্ত আছে এই অভিযোগে কোনো জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে যদি কোনো প্রকার মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট ও হুলিয়া থাকে তাহলে বিনাশর্তে সেসব মামলা, অভিযোগ,ওয়ারেন্ট ও হুলিয়া প্রত্যাহার ও বিচারের রায় বাতিল করা এবং কারো বিরুদ্ধে কোনো রকম আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

৪.

ক) পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের উন্নতিকল্পে কৃষি, শিক্ষা, সমবায়, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, ধর্ম, ভাষা, ব্যবসা-বানিজ্য, পশুপালন, রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ, মৎস, বন, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ খাতে বিশেষ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও সেজন্য কেন্দ্রীয় তহবিল হতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্ধ করা।

খ) পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি নিজস্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা।

গ) বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও অন্যান্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা এবং বিদেশে গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা।

ঘ) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এবং প্রতিরক্ষাবাহিনীতে জুম্ম জনগণের জন্য নির্দিষ্ট কোটা সংরক্ষণ করা।

৫. পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য–

ক) সাজাপ্রাপ্ত অথবা বিচারাধীন অথবা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর হাতে আটককৃত সকল জুম্ম নর-নারীকে বিনাশর্তে মুক্তি প্রদান করা।

খ) পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের উপর সকল প্রকার নির্যাতন, নিপীড়ন বন্ধ করা।

Dhaka University Institutional Repository

গ) পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে গুচ্ছগ্রাম ও আদর্শ গ্রামের নামে গ্রুপিং করার কার্যক্রম বন্ধ করা এবং গুচ্ছ ও আদর্শ গ্রামসমূহ ভেঙ্গে দেওয়া।

ঘ.

(১) বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চল থেকে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'বে-আইনী' অনুপ্রবেশ, পাহাড় ও সমভূমি ক্রয়, বন্দোবস্তী, বেদখল ও বসতি স্থাপন বন্ধ রাখা।

(২) দীঘিনালা, রুমা আলিকদম সেনানিবাসসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সকল ক্যাম্প পর্যায়ক্রমে তুলে নেওয়া।

জনসংহতি সমিতির ৫ দফার প্রেক্ষিতে এরশাদ সরকারের ৯ দফা প্রস্তাব সমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. সংবিধানের ২৮ ধারার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলাকে বিশেষ এলাকা হিসেবে চিহ্নিতকরণ।

২. সংবিধানের ৯ ও ২৮ ধারার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন পৃথক পৃথক জেলা পরিষদ গঠন।

৩. বিষয়ভিত্তিক (Division Of Subjects) স্থিরকরণ।

৪. সংবিধানের ৬৫ ধারার আলোকে জেলা পরিষদসমূহকে মূল আইনের অধীন নির্দিষ্ট বিষয়ে উপ-আইন, আদেম, বিধি, প্রবিধান ইত্যাদি প্রণয়ন, জারী এবং কার্যকরী করার ক্ষমতা অর্পণ।

৫. জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন জেলা পরিষদ কর্তৃক নিজস্ব এলাকার জন্য আপত্তিকর বিবেচিত হলে সংসদে পূনর্বিবেচনার জন্য সরকারকে আইন ক্ষমতা অর্পণ।

Dhaka University Institutional Repository

৬. জেলা ও উপজাতীয় সার্কেলের এলাকা একত্রীকরণার্থে সীমানা পুনঃনির্ধারণ।

৭. জেলা প্রধান ও উপজাতীয় প্রধানের সংবলিত অবস্থান নির্ণয়ন।

৮. প্রতি সার্কেলে পুলিশ বাহিনী গঠন।

৯.পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েলের যথাযথ সংশোধন, বাস্তবায়ন অথবা বাতিলকরণ।

১৯৯২ সালের ৪ ডিসেম্বর জনসংহতি সমিতি যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে তাদের সংশোধীত ৫ দফা দাবিনামা সরকারের নিকট পেস করে। নিম্নে ৫ দফা দাবিসমূহ তুলে ধরা হলোঃ

চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরং বোম, লুসাই, পাংখো, খুমি খিয়াং ও চাক– ভিন্ন ভাষাভাষী এই দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির আবাসভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম। যুগ যুগ ধরিয়া এই দশটি ভিন্ন ভাষাভাষী জাতি নিজস্ব সমাজ, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, ধর্ম ও ভাষা লইয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করিয়া আসিতেছে। বিশ্বের প্রতিটি জাতি বড় হোউক বা ক্ষুদ্র হোউক সব সময়ই নিজস্ব ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে স্বীয় জাতীয় সংহতি ও জাতীয় পরিচিতি অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইয়া আসিতেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের দশটি ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম ও পাহাড়ী জনগণও এর ব্যতিক্রম নয়।

ভারতের বৃটিশ সরকার এই মর্মকথা অনুধাবন করিতে সক্ষম হওয়ায় ১৯০০ সালের ৬ জানুয়ারি ' পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি-১৯০০' প্রণয়ন করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখে। ইহার পরে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে উক্ত শাসনবিধিকে পুনরায় স্বীকৃতি প্রদান করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক শাসিত অঞ্চল রূপে ঘোষনা করে। কিন্তু বৃটিশরা ১৯৪৭ সালের অগাস্ট মাসে অ-মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন ক্ষমতা পাকিস্তান সরকারের হস্তে অর্পণ করিয়া চলিয়া যায়। পাকিস্তান সরকার সংশোধীত ৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসনের স্বীকৃতিও প্রদান করে। পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র ১৯৫৬ সালে প্রথম গৃহীত হয় এবং এই শাসনতন্ত্রেও ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চল রূপে ঘোষনা করা হয়। ১৯৬২ সাল পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষনা করা হয়। এই শাসনতন্ত্রে ৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে ব্যবহৃত 'পৃথক শাসিত অঞ্চল' শব্দের পরিবর্তে 'উপজাতীয় অঞ্চল' শব্দ ব্যবহার করিয়া ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতীয় অঞ্চলের মর্যাদায় স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বস্তুত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এই শাসনবিধি উপনিবেশিক, সামন্ততান্ত্রিক, অগণতান্ত্রিক এবং ত্রুটিপূর্ণ।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধনী হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এই স্বাধীনতা যেন সকলের নিকট অর্থপূর্ণ হইতে পারে তজ্জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণও দেশ ও জাতির মহান কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করিয়া বাংলাদেশের উপযুক্ত নাগরিক হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহিয়াছিল। তদুদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়া নিজস্ব আইন পরিষদ সংবলিত স্বায়ত্বশাসনের আবেদন করা হইয়াছিল। কিন্তু তদানীন্দন বাংলাদেশ সরকার জুম্ম জনগণের সকল প্রকারের আবেদন ও বাসনা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া এবং পার্বত্য অঞ্চলের পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তা চিরতরে লুপ্ত করিয়া দিয়া ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশের প্রথম শাসনতন্ত্র ঘোষণা করে। ফলতঃ জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও ভূমির স্বত্ব সংরক্ষণের যতটুকু আইনগত অধিকার ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিতে ছিল তাহাও ক্ষুন্ন হইয়া যায়।

বৃটিশ শাসনামল হইতে আজ অবধি জুম্ম জনগণ সকল ক্ষেত্রে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত হইয়া আসিতেছে। ফলশ্রুতিতে ভিন্ন ভাষাভাষী দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির জাতীয় অস্তিত্ব আজ চির বিলুপ্তির পথে। ইহা নিঃসরন্দহে বলা যায় যে শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, আচার-অনুষ্ঠান, দৈহিক ও মানসিক গঠন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা প্রভৃতির ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ ও বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে অনেক মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। নিরীহ ও শান্তপ্রিয় জুম্ম জনগণও বাংলাদেশের অপরাপর জনগণের ন্যায় দেশ মাতৃকার সেবা করিতে দৃঢ় সংকল্প কিন্তু বিশেষ এক শ্রেণীর লোকে ষড়যন্ত্রের ফলে ঐতিহাসিকভাবে আজ তাহারা সেই মহান দায়িত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। অথচ এই দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করিবার ক্ষেত্রে জুম্ম জনগণ নীরবে সকল বঞ্চনা ও নিপীড়ন সহ্য করিয়াও অপরিসীম ত্যাগ স্বীকারে দ্বিধাবোধ করে নাই।

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশ প্রদত্ত ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি জুম্ম জনগণের জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে পারে নাই। অনুরূপ 'পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ' দ্বারাও জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব, ভূসিস্বত্ত্বা ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হইতে পারে নাই। কারণ এই পার্বত্য জেলাপরিষদসমূহ অগণতান্ত্রিক, সামন্ত তান্ত্রিক, কম ক্ষমতা সম্পন্ন ও ত্রুটিপূর্ণ। বস্তুত গণতান্ত্রিক স্বায়ত্ত্বশাসন ব্যতিরেকে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব, ভূমিস্বত্ত্ব ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব অর্থাৎ দশ ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণের সংহতি, সংস্কৃতি সামাজিক সংগঠন, অভ্যাস, প্রথা, ভাষা প্রভৃতি এবং ভূমিস্বত্ত্ব অর্থাৎ পাহাড়, বন ও ভূমির স্বত্ত্ব সংরক্ষণের জন্য, সর্বোপরি মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার এবং সকল প্রকারের পশ্চাদপদতা অতি দ্রুত গতিতে অবসান করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের বৃহত্তম স্বার্থে জুম্ম জনগণের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কর্তৃক ১৯৮৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের নিকট পেশকৃত আইন পরিষদসহ প্রাদেশিক স্বয়ত্ত্বশাসন সম্বলিত ৫ দফা দাবি সংশোধিত আকারে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত গণপ্রজাতন্ত্রি বাংলাদেশ সরকারের নিকট উপস্থাপন করা গেল–

১. গণপ্রজাতন্ত্রি বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করিয়া-

ক)পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান করা।

খ) আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বিত আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বশাসন পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রদান করা।

গ) এই আঞ্চলিক পরিষদ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হইবে এবং ইহার একটি কার্যনির্বাহী কাউন্সিল থাকিবে।

ঘ) আঞ্চলিক পরিষদে অর্পিত বিষয়াদির উপর এই পরিষদ সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে বিধি, প্রবিধান, উপবিধি, উপআইন, আদেশ, নোটিশ প্রণয়ন, জারি ও কার্যকর করিবার ক্ষমতার অধিকারী হইবে।

ঙ) পরিষদের তহবিল ও সম্ভাব্য আয়ের সাথে সংগতি রাখিয়া স্বাধীনভাবে হাতে থাকিবে।

Dhaka University Institutional Repository

চ) আঞ্চলিক পরিষদ নিম্নক্তো বিষয়সমূহ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হবে-

(১) পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা;

(২) জেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ;

(৩) পুলিশ;

(৪) ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;

(৫) কৃষি, কৃষি ও উদ্যান উন্নয়ন;

(৬) কলেজ, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা;

(৭) বন, বনসম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;

(৮) গণস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা;

(৯) আইন ও বিচার;

(১০) পশুপালন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ;

(১১) ভূমি ক্রয়, বিক্রয় ও বন্দোবস্ত;

(১২) ব্যবসা-বানিজ্য;

(১৩) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প;

(১৪) রাস্তাঘাট ও যাতায়াত ব্যবস্থা;

(১৫) পর্যটন;

(১৬) মৎস, মৎসসম্পদ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(১৭) যোগাযোগ ও পরিবহন;

(১৮) ভূমি রাজস্ব, আফগারী শুল্ক ও অন্যান্য কর ধার্যকরণ;

(১৯)পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ;

(২০) হাট-বাজার ও মেলা;

(২১) সমবায়;

(২২) সমাজ কল্যান;

(২৩) অর্থ;

(২৪) সংস্কৃতি, তথ্য ও পরিসংখান;

Dhaka University Institutional Repository

(২৫) যুব কল্যাণ ও ক্রিড়া;

(২৬) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা;

(২৭) মহাজনী কারবার ও ব্যবসা;

(২৮) সরাইখানা, ডাকবাংলা, বিশ্রামাগার, খেলার মাঠ ইত্যাদি;

(২৯) মদ চোলাই, উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও সরবরাহ;

(৩০) গোরস্থান ও শ্মশান;

(৩১) দাতব্য প্রতিষ্ঠান, আশ্রম, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনাগার;

(৩২) জলসম্পদ ও সেচ ব্যবস্থা;

(৩৩) জুম চাষ ও জুম চাষীদের পূনর্বাসন;

(৩৪) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;

(৩৫) কারাগার;

(৩৬) পার্বত্য চট্রগাম সংক্রান্ত অন্যান্য কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২.

(ক) চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরং, বোম, লুসাই, পাংখো, খুমী, খিয়াং ও চাক– এই ভিন্ন ভাষাভাষী দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা;

(খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি 'বিশেষ শাসনবিধি' অনুসাওে শাসিত হইবে–সংবিধানে এইরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করা;

(গ) বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হইতে আসিয়া কেহ বসতি স্থাপন, জমি ক্রয় ও বন্দোবস্ত করিতে না পারে সংবিধানে সেই রকম বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করা;

(ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা নন এই রকম কোনো ব্যক্তি পরিষদেও অনুমতি ব্যতিরেকে যাহাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করিতে না পারে সেইরকম আইনবিধি প্রণয়ন করা। তবে শর্ত থাকে যে কর্তব্যরত সরকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবেনা;

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ)

১. গণভোটের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মতামত যাচাইয়ের ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় লইয়া কোনো শাসনতান্ত্রিক সংশোধন যেন করা না হয় সংবিধানে সেইরকম সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা;

২. আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যের পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় লইয়া যাহাতে কোনো আইন অথবা বিধি প্রণীত না হয় সংবিধানে সেইরকম সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা;

চ) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের লইয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বতন্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠন করা। তদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি প্রণয়ন করা;

ছ) যুদ্ধ বা বহিঃআক্রমণ ব্যতীত আভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে বা উহার যে কোনো অংশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন হইলেও আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যের পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামেযেন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা না হয় সংবিধানে সেইরকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা;

জ) পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন কোনো ব্যক্তিকে যেন নিয়োগ করা না হয় সেইরকম আইন প্রণয়ন করা। তবে কোনো পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে উক্ত পদে নিয়োগ করা;

২.১.

(ক) রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দাবান এই তিনটি জেলা বলবৎ রাখিয়া একত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি প্রশাসনিক ইউনিটে পরিণত করা;

(খ)

১. পার্বত্য চট্টগ্রামের নাম পরিবর্তন করিয়া 'জুম্মল্যণ্ড' নামে পরিচিত করা;

Dhaka University Institutional Repository

২. পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি পৃথক মন্ত্রনালয় স্থাপন করা;

৩. পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণের জন্য একটি বিশেষ বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা;

৪. পার্বত্য চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে জুম্ম জনগণের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখিবার বিধান করা;

৫.

(ক) কাপ্তাই বিদ্যুৎ প্রকল্পের কেন্দ্র এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এলাকা এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিগ্রহণকৃত জমি ব্যতীত অন্যান্য সকল শ্রেণীর জমি, পাহাড় ও কাপ্তাই হ্রদ এলাকা এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চলসহ অন্যান্য সকল বনাঞ্চল পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন করা;

(খ) কাপ্তাই বিদ্যুৎ প্রকল্পের কেন্দ্র এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এলাকা এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিগ্রহণকৃত জমির সীমানা সুনির্দিষ্ট করা;

(গ) পরিষদের নিয়ন্ত্রনাধীন ও আওতাধীন কোনো প্রকারের জমি, পাহাড় পরিষদের সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কতৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর না করিবার প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা নন এমন ব্যক্তির দ্বারা বেদখলকৃত বা অন্য কোনো উপায়ে বন্দোবস্ত কৃত বা ক্রীত বা হস্তান্তরকৃত সমস্ত জমি ও পাহাড়ের প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পরিষদেও নিকট হস্থান্তও করা;

(ঙ) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা নন এমন কোনো ব্যক্তির নিকট বা কোনো সংস্থাকে যে সমস্ত জমি বা পাহাড় রাবার চাষ, বনায়ন অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে লিজ বা বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে, সেই সমস্ত জমির লিজ বাতিল করা এবং ঐসমস্ত জমিও পাহাড়ী পরিষদের নিয়ন্ত্রণ বা আওতাধীন করা;

Dhaka University Institutional Repository

(চ) সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত সকল এলাকা পরিষদেও নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন করা;

৩.

ক) ১৯৪৭ সালের পূর্ব হইতে যাহারা বেআইনীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করিয়া ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্ত ও বেদখল করিয়া অথবা কোনো প্রকারের পাহাড় বা জমি ক্রয়, বন্দোবস্ত ও বেদখল ছাড়াই গুচ্ছগ্রামে বসবাস করিতেছে সেই সকল বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া;

খ) ১৯৬০ সালের পর হইতে যে সকল জুম্ম নর-নারী ভারতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের সকলের সম্মানজনক প্রত্যাবর্তন ও সুষ্ঠ পূনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

গ) কাপ্তাই বাঁধের সর্বোচ্চ জলসীমা নির্ধারণ করা এবং কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের সুষ্ঠ পূনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৪.

ক) সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ক্যাম্প ব্যতীত সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর সকল ক্যাম্প ও সোনিবাস পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে তুলিয়া লওয়া;

খ) বহিঃশত্রুও আক্রমণ, যুদ্ধাবস্থায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনো সেনাবাহিনীর সমাবেশ না করা ও সেনানিবাস স্থাপন না করা;

৪.(১)

ক)পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সকল সদস্যের যথাযথ পূনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে যদি কোনো প্রকারের মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট ও ঝুলিয়া থাকে অথবা কারও অনুপস্থিতিতে কোনো বিচার নিস্পত্তি হয়ে থাকে তাহলে বিনাশর্তে

Dhaka University Institutional Repository

সেসব মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট ও হুলিয়া প্রত্যাহার ও বিচারের রায় বাতিল করা এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা;

গ) পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতির কাজের সাথে যুক্ত আছে এই অভিযোগে কোনো জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে যদি কোনো প্রকার মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট ও হুলিয়া থাকে তাহলে বিনাশর্তে সেসব মামলা, অভিযোগ,ওয়ারেন্ট ও হুলিয়া প্রত্যাহার ও বিচারের রায় বাতিল করা এবং কারো বিরুদ্ধে কোনো রকম আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

(২)

ক) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ও প্রতিরক্ষা বাহিনীতে জুম্ম জনগণের জন্য নির্দিষ্ট কোটা সংরক্ষণ করা;

খ) বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ক্যাডেট কলেজ, কারিগরী ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা এবং বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা লাভের সুযোগ প্রদান করা।

গ) সরকারী চাকরীতে জুম্ম জনগণের বয়ঃসীমা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা;

৩.

ক) সরকারী অনুদানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা;

খ) ভূমিহীন ও জুম্ম চাষীদেও পুনর্বাসনসহ কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, রাস্তাঘাট প্রভৃতি খাতে বিশেষ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও তজ্জন্য সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্ধ করা;

৫.

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বহাল রাখা এবং উহা পরিষদেও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনা। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে অনুকুল পরিবেশ গড়িয়া তোলা একান্ত অপরিহার্য এবং তৎজন্য–

Dhaka University Institutional Repository

ক) সাজাপ্রাপ্ত অথবা বিচারাধীন অথবা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর হাতে আটককৃত সকল জুম্ম নর-নারীকে বিনাশর্তে মুক্তি প্রদান করা।

খ) পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনকে অনতিবিলম্বে বেসামরিকীকরণ করা;

গ) জুম্ম জনগণকে গুচ্ছগ্রাম, বড়গ্রাম, শান্তিগ্রাম, যুক্তগ্রাম ও আদর্শগ্রামের নামে গ্রুপিং করিবার কার্যক্রম বন্ধ করা এবং এই গ্রামসমূহ অনতিবিলম্বে ভাঙ্গিয়া দেওয়া;

ঘ) বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চল হইতে আসিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ, বসতি স্থাপন, পাহাড় ও ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্ত, হস্তান্তর ও বেদখল বন্ধ করা;

ঙ) পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে ও গুচ্ছগ্রামে বসবাসরত বহিরাগতদের পর্যায়ক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অনতিবিলম্বে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া;

চ) সীমান্তবাহিনীর ক্যাম্প ব্যতীত অন্যান্য সামরিক, আধাসামরিক বাহিনীর সেনানিবাস ও ক্যাম্পসমূহ পর্যায়ক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে তুলিয়া লওয়া।

তৎকালীন পরিকল্পনামন্ত্রি এ. কে খন্দকারের নেতৃত্বে ৬ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি শান্তি বাহিনীর সাথে কোনো প্রকার ঐক্যমতে পৌছাতে না পেরে পার্বত্য নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে একটি কাঠামো দাঁড় করাতে সক্ষম হয়। এই কাঠামোর ভিত্তিতে সরকার এবং তিন পার্বত্য জেলার গণ্যমান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে জাতীয় সংসদে তিন পার্বত্য জেলার জন্য তিনটি পৃথক স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল পাস হয়। যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি পৃথক স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৬.১১। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদঃ

পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ আইনকে অসাংবিধানিক ও বাতিল ঘোষনা করেছেন হাইকোর্ট। রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দাবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ সংশোধনী আইনের অসাংবিধানিক ধারাও বাতিল করে ৫ দফা নির্দেশনা দিয়েছেন হাইকোর্ট। ১৩ এপ্রিল ২০১০, বিচারপরি সৈয়দ রেফাত আহামেদ ও বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরির সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় দেন।

রায়ে চুক্তি সম্পর্কে যা বলা হয়েছেঃ

রায়ের পর্যবেক্ষণে আদালত বলেন, শান্তি চুক্তি হলো একই রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্য মান দুটি পক্ষেও মধ্যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক সমঝোতা। এটিকে শান্তিচুক্তি হিসেবে গণ্য করা যায়না। এর মাধ্যম সংঘাতে লিপ্ত দুটি পক্ষ অস্ত্র সমর্পণে সম্মত হয়েছিল। যার মধ্য দিয়ে শান্তির শর্তাবলী নির্ধারিত হয়েছে। এজন্য আমরা মনে করিনা যে সংবিধানের ১৪৫(১) ও (এ) অনুযায়ী এটি চুক্তি। শুধু দুটি পক্ষের মধ্যে রাজনৈতিক চুক্তি বা সমঝোতা, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার ও উপজাতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে সশস্ত্র বৈরিতা সমাপ্তির লক্ষ্যে রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রতিফলন হয়েছিল। একারণে এটি বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার বিষয় নয়। আদালতে পর্যবেক্ষণে আরো বলা হয়, একটি অনগ্রসর গোষ্ঠীকে সুবিধা দিতে গিয়ে রাষ্ট্রের বিশাল জনগোষ্ঠীর সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে, যা সংবিধানের ২৭ নং অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন।

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির আলোকে ১৯৯৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন করা হয়। এছাড়া 'পার্বত্য জেলা কাউন্সিল আইন ১৯৮৯'-তে সংশোধনী এনে 'রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দবান জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ সংশোধনী আইন ১৯৯৮' প্রণয়ন করা হয়। আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও সংশোধীত জেলা পরিষদ আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ২০০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দা মোঃ বদিউজ্জামান হাইকোর্টে রিট করেন। ২০১০ সালের ২৯ জানুয়ারি এ রিট মামলার রুলের উপরে চূড়ান্ত শুনানি গ্রহণ শুরু করেন। ২৩ মার্চ পর্যন্ত শুনানি চলে। চূড়ান্ত শুনানি শেষে ১২ এপ্রিল থেকে আদালত রায় দেওয়া শুরু করেন এবং শেষ করেন ১৩ এপ্রিল।

Dhaka University Institutional Repository

৬.১২। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৭: সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ

১৯৯০ সালের জুলাই মাসে স্পেসাল এফেয়ার্স বিভাগ নামে একটি পৃথক বিভাগ গঠন করা হয়। এই বিভাগের প্রধান ও একমাত্র কাজ হলো– পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি দেখাশোনা, তদারকি এবং সমন্বয় সাধন প্রভৃতি। তাই এরশাদ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রনালয়ের সাথে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে এই বিভাগটির দায়িত্ব ন্যাস্ত করেন তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতির হাতে; যাতে করে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়ন কাজে কোনো মন্ত্রনালয়ের অতিরিক্ত সময় অপচয় না হয় এবং জটিলতার সৃষ্টি না হয়। পরবর্তী সময়ে খালেদা সরকার ১৯৯১ সালে উক্ত ' স্পেসাল এফেয়ার্স বিভাগ' কে সচিবালয়ে অন্তভূক্তি করার মধ্য দিয়ে এই বিবাগকে আরো শক্তিশালী করা হয়। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য শান্তি চুক্তির পর এই বিভাগটিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। উক্ত মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় উপজাতীয় নেতা কল্পরঞ্জন চাকমাকে।

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীনে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত খালেদা জিয়া সরকার ক্ষমতা গ্রহনের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন। সমস্যা সমাধানের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সশস্ত্র ইন্সার্জেন্টের জন্য সাধারণ ক্ষমতা ঘোষণা করেন। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে শান্তিবাহিনীর সাথে সংলাপ অব্যাহত রাখার জন্য উপজাতীয় নেতা হংসধ্বজ চাকমাকে আহবায়ক করে ৬ সদস্য বিশিষ্ঠ একটি লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া ২০ অক্টোবর ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়াকে প্রধান করে ৮ সদস্য বিশিষ্ঠ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রিপরিষদ এবং ৯ জুলাই ১৯৯২ তারিখে তৎকালীন যোগাযোগমন্ত্রি কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমদের নেতৃত্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংসদ সদস্যের সমন্বয়ে ৯ সদস্য বিশিষ্ঠ একটি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়।

এছাড়া রাশেদ খান মেননকে প্রধান করে তৈরি করা হয় আর একটি উপকমিটি। খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে সংসদীয় কমিটির সাথে শান্তি বাহিনীর সাতটি বৈঠক অনুষ্ঠীত হয় (১ম–৫ নভেম্বর ১৯৯২; ২য়–২৬ ডিসেম্বর ১৯৯২; ৩য়–২২মে ১৯৯৩; ৪র্থ–১৪ জুলাই ১০৯৩; ৫ম–১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩; ৬ষ্ঠ–২৪ নভেম্বর ১৯৯৩; ৭ম–৫ মে ১৯৯৪)। তবে একথা সত্য যে, শান্তিবাহিনীও আলোচনার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। তারই বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আমরা দেখি

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯২ সালের ১লা অগাস্ট শান্তিবাহিনী একতরফাভাবে অস্ত্র বিরতি ঘোষণা করে এবং ৩৫ দফায় ৩১ ডিসেম্বর ৯৭ পর্যন্ত অস্ত্র বিরতির সময়সীমা বৃদ্ধি করে। সরকার পক্ষও আলোচনার সুবিধার্থে অস্ত্র বিরতি মনে চলে। এছাড়া খালেদা জিয়া সরকার ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নেওয়া উপজাতীয় শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ভারত সরকারের সাথে ১৯৯৩ সালের ৯ মে একটি সমঝোতা চুক্তিতে উপনীত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ সালে ৩৭৯ টি পাহাড়ী শরণার্থী পরিবারের (প্রথম ব্যাচ) বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে। তবে একথা সত্য যে এই প্রত্যাবর্তন অব্যাহত থাকলেও আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি।

সংসদীয় কমিটি (জাতীয় কমিটি) এবং সংসদীয় কমিটির উপকমিটি ১৩ বৈঠকের মাধ্যমে শান্তিবাহিনীর সাথে যে আলোচনা হয় তা ১৯৯৭ সালের শান্তি চুক্তির একটি পথ তৈরি করে দিয়েছিল। এই সময়ে শান্তি বাহিনীর প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের পরিবর্তে আঞ্চলিক স্বয়ত্বশাসনের কথা উল্লেখ করে এবং সরকারও নমনীয় ও সম্মতিসূচক অবস্থান গ্রহণ করে। বিশেষ করে জনসংহতি সমিতির দাবি অনুযায়ী খালেদাজিয়া সরকার পার্বত্য অঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলে প্রতিরক্ষায় অপরিহার্য সামরিক ক্যাম্প ছাড়া অস্থায়ী ক্যাম্প সমূহ তুলে নেওয়ার ব্যাপারেও সম্মত হয়।

শুধু তাই নয় ১৯৮৯ সালে পাসকৃত পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের সংশোধন, পরিবর্ধন পরিমার্জন করে একটি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল আইনের মধ্য দিয়ে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌছা এবং চুক্তি সই করার প্রায় দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছিল। এভাবে খালেদা জিয়া সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছিল যা সমাধানের পথে এক নুতন দিগন্তের অবতারণা করে।

১৯৯৬ সালের ২৩ জুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একটি নিরপেক্ষ নির্বচনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতা গ্রহনের পর পরই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে মনোনিবেশ করেন। কারণ নির্বাচনি ইস্তেহারে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও স্থিতীশীলতা ফিরিয়ে আনার কার্যকর ব্যাবস্থা নেওয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিকভাবে সমাধান করা – মর্মে ঘোষণা দেওয়া। ফলশ্রুতিতে নির্বাচনে আওয়ামীলীগ পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটে আসনই লাভ করে যা সরকারের জন্য সমস্যা সমাধান

Dhaka University Institutional Repository

প্রক্রিয়ায় এগিয়ে নিতে বহুলাংশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জনসংহতি সমিতি অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করে যা সরকারও করে। ফলে পূর্ববর্তী সমিতির সাথে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তৎকালীন জাতীয় সংসদের চীপ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি হঠন করা হয়।

উক্ত জাতীয় কমিটির সাথে জনসংহতি সমিতির সাত দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।(১ম বৈঠক ২১ ডিসেম্বর থেকে ২৪ ডসিম্বর ১৯৯৬; ২য় বৈঠক ২৫ জানুয়ারি থেকে ২৭ জানুয়ারি ১৯৯৭; ৩য় বৈঠক ১২ মার্চ থেকে ১৩ মার্চ ১৯৯৭; ৪র্থ বৈঠক ১১ মে থেকে ১৪ মে ১৯৯৭; ৫ম বৈঠক ১৪ জুলাই থেকে ১৮ জুলাই ১৯৯৭; ৬ষ্ঠ বৈঠক ১৪ সেপ্টম্বর থেকে ১৭ সেপ্টম্বর ১৯৯৭; ৭ম বৈঠক ২৬ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর ১৯৯৭) সাতটি বৈঠকের সকল সমাপ্তি ঘটে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখে। উক্ত দিন প্রধানমন্ত্রীর আন্ত র্জাতিক সম্মেলন কক্ষের লবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে চীপহুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা অরফে সন্তু লারমা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চুক্তির মুহূর্তে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে অস্ত্র জমা দিতে আসা শান্তি বাহিনীর সদস্যরা

বান্দরবানের রাজা অঙ শৈ প্রু ও মাসুমা সুলতানা

Dhaka University Institutional Repository

৬.১৩। চুক্তির সফলতা ও বিফলতা:

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির দীর্ঘ ১২ বছর (এক যুগ) পূর্ণ হয়েছে ২ ডিসেম্বর ২০১০। স্বায়ত্তশাসনকামী পাহাড়ীদের সঙ্গে মধ্য সত্তরের দশক থেকে চলে আসা এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছিল এই চুক্তি আজ থেকে ১২ বছর আগে ঠিক এই তারিখেই। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (জে এস এস) মধ্যে চুক্তিটি সই হয়। এর মূল লক্ষ্য ছিল, দেশের সংবিধান অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান। চুক্তি অনুযায়ী সরকারের প্রধান করণীয় ছিল, পার্বত্য চট্টগ্রাকে বিশেষ অঞ্চলের স্বীকৃতি দিয়ে সেখানে বিশেষ শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা, ভূমি সমস্যার নিস্পত্তি, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও পাহাড়ী বা জুম্ম উদ্বাস্তুদের পূণর্বাসন এবং জুম্মদের জীবনাচরণ সংরক্ষন।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রতিটি সরকারই দাবী করে এসেছে যে চুক্তির বাস্তবায়ন কাজ এগোচ্ছে। তবে চুক্তির মৌলিক বিষয়ের কোনোটিই এখন পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। এখনো সেখানে একাধীক সআন্তরাল শাসন চলছে, যার মধ্যে সবচেয়ে নাজুক অবস্থানে আছে স্থানীয় সরকারের আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদ। অথচ চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ গঠিতই হয়েছিল তিন জেলার শাসন কাঠামো হিসেবে।

চুক্তি স্বাক্ষরের পরও অনেক পাহাড়ী পরিবারকে তাদের বংশ পরম্পরায় ভোগদখল করা জমি বা বাগান থেকে জোর করে উচ্ছেদ করা হয়েছে। একাধকি বেসরকারী সংগঠন ও অসংখ্য ব্যেক্তির নামে বেআইনিভাবে পার্বত্য অঞ্চলের বিপুল পরিমান জমি ইজারা দেওয়া হয়েছে। সরকারের পদস্থ অনেক ব্যক্তিও অনেক জমি ইজারা নিয়েছেন। সরকারের বন বিভাগ পাহাড়ীদেও জুম ভূমি থেকে উচ্ছেদ কওে সেগুন বাগান করেছে। সেনানিবাসের জন্য হাজার হাজার একর জমি বরাদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি বর্তমান সরকারও ক্ষমতা গ্রহনের পর পাহাড়ীদেরভূমি থেকে উচ্ছেদ, দখল ও খুনের মত ঘটণাও ঘটছে।

৬.১৪। পূর্ণ বাস্তবায়নের প্রসঙ্গে:

বিগত নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে স্পষ্টভাবে অঙ্গীকার করা হয়েছে, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।'

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতা গ্রহণের পরও সরকারের পক্ষ থেকে একাধিকবার বলা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের কথা। তবে জেএসএসের অভিযোগ, মহাজোট সরকার ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করলেও চুক্তির মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন এখনো শুরু করা হয়নি। জেএসএসের তথ্য ও প্রচার বিভাগের প্রধান মঙ্গল কুমার চাকমা সম্প্রতি প্রথম আলোকে বলেন, চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে সরকারকে একটি সময়সূচিভিত্তিক পরিকল্পনা করে এগোতে হবে।

জেএসএসের দাবি, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়নের ওপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে–

ক. পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া;

খ. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ-সংবলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থা কার্যকর করা এবং এদের কাছে হস্তান্তরিত বিষয়গুলো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কার্যকর এবং এ-সংক্রান্ত আইনগত অসংগতি দূর করা;

গ. ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া;

ঘ. সব অস্থায়ী সেনাক্যাম্প ও 'অপারেশন উত্তরণ' প্রত্যাহার এবং 'শান্তকরণ প্রকল্প' বাতিল করে এ অঞ্চলের প্রশাসনকে বেসামরিকীকরণ করা;

ঙ. প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী, অভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু এবং জেএসএসের অস্ত্র জমাদানকারী সদস্যদের পুনর্বাসন করা।

এ প্রসঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদার প্রথম আলোকে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের সব কাজ লিগিরই পূর্ণতা পাবে। তিনি বলেন, বিগত সাত-আট বছরের স্থবিরতা কাটিয়ে নতুন আঙ্গিকে পুরো প্রক্রিয়াকে সঞ্চালিত করা একটু সময়সাপেক্ষ। তবে সরকার এ

Dhaka University Institutional Repository

প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ইতিমধ্যে চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সরকারের অন্য সূত্রগুলো জানায়, এই সময়ে তিন পার্বত্য জেলায় জেলা ও দায়রা জজ আদালত স্থাপিত হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ের কয়েকটি বিভাগ আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে। মোবাইল ফোন চালুর বিষয়টিকে চুক্তির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত করে দেখা না হলেও এর সঙ্গে পার্বত্য জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সম্পৃক্ত।

৬.১৫। যা বাস্তবায়িত হয়েছে:

১৯৯৭ সালের ২২ ডিসেম্বর চুক্তিটি মন্ত্রিপরিষদে পাস হয়ে প্রজ্ঞাপন জারি হয়। পরের বছর চার দফায় জনসংহতি সমিতির সদস্যরা অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফেরেন। তখন তাঁদের প্রত্যেককে সরকার ৫০ হাজার টাকা করে দেয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১০০ দিনের মধ্যে যে কাজগুলো সম্পন্ন করার কথা ছিল, এর অংশ হিসেবেই গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়। ১৯৯৮ সালের ৩, ৪ ও ৫ মে যথাক্রমে রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন এবং ৬ মে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন পাস হয়। ১৯৯৯ সালের ৯ মে অন্তর্বর্তীকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়।

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে পাহাড়ি শরণার্থীদের দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। সরকার বলছে, এর অধিকাংশ পরিবারকে অর্থনৈতিক সুবিধাদিও দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৮ সালের ২০ জানুয়ারি প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনসংক্রান্ত টাস্কফোর্স গঠিত হয়। সে বছরই সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করে। তবে ২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। এ ছাড়া জেএসএসের ৬৪ জন ও প্রত্যাগত শরণার্থীদের ১৮৪ জনকে তাঁদের সরকারি চাকরিতে পুনর্বহাল করা হয়। জেএসএসের ৬৭৫ জনকে পুলিশ কনস্টেবল ও ১১ জনকে ট্রাফিক সার্জেন্ট পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।

বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে চুক্তির বাস্তবায়ন কার্যত বন্ধ ছিল। তবে তৎকালীন

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় সরকারমন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি এ বিষয়ে অন্তত ১১ বার বৈঠক করে। এ সময় স্থানীয় পর্যায়ের কয়েকটি বিভাগের দায়িত্বও জেলা পরিষদগুলোর হাতে ন্যস্ত করা হয়।

৬.১৬ গুরুত্বপূর্ণ যা ঝুলে আছে:

পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলের স্বীকৃতি দেওয়া এবং এ বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের কোনো পদক্ষেপ সরকার এখন পর্যন্ত নেয়নি। অভিযোগ আছে, আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব এবং ক্ষমতাও কার্যকর করা হয়নি। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছেও যথাযথ দায়িত্ব ও ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়নি। আঞ্চলিক পরিষদ বিধিমালাসহ অন্যান্য বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়নি। আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদের নির্বাচনও করা হয়নি। এসব পরিষদের বাজেট বরাদ্দ অপ্রতুল এবং তা কয়েক বছর ধরে কমছে বলে জানা গেছে। চুক্তি অনুযায়ী তিন জেলার অস্থায়ী সেনাক্যাম্পও সরিয়ে নেওয়া হয়নি। এ ধরনের প্রায় ৫০০ ক্যাম্পের মধ্যে বর্তমান সরকার ৩৫টি এবং এর আগে আরও ৩১টি ক্যাম্প সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে সরকারি-বেসরকারি সূত্রগুলো জানায়।

১৯৭৯ সাল থেকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় পার্বত্য চট্টগ্রামে যে বাঙালি অভিবাসন হয়, আজকের ভূমিসংকটের গোড়া সেখানে। অভিযোগ আছে, নয় হাজার ৩২৬টি শরণার্থী পাহাড়ি পরিবার এখনো তাদের জমিজমা ফেরত পায়নি। এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ পাহাড়ি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা হয়নি। এ ছাড়া জেএসএসের অভিযোগ, অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা, জমির ইজারা ও ভোটার তালিকাসহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে চুক্তি লঙ্ঘন করা হয়েছে। অভিবাসী বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে অবশ্য চুক্তিতে কিছু নেই। তবে জেএসএসের দাবি, সে রকম অলিখিত চুক্তি ছিল।

চুক্তির প্রধান উদ্দেশ ছিল গৃহযুদ্ধের অবসান। সেদিক থেকে চিন্তা করলে চুক্তির উদ্দেশ্য অকেটাই সফল হয়েছে। এখন সেখানে আর গৃহযুআবস্থা বিরাজ করছেনা, কেউ কারো প্রতি অস্ত্র তাক করছেনা । বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত সেখানেও মানুষ অবাধে চলাচল করতে পারছে। বিদ্রোহীরা অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবকি জীবনে ফিরে গেছে। এখন আর পার্বত্য চট্টগ্রামে বারতি সেনা, বারতি অস্ত্র আর বায়তি

Dhaka University Institutional Repository

রসদ পাঠাতে হচ্ছেনা।সামরিক খাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বাড়তি বরাদ্দেরও প্রয়োজন নেই।চুক্তি স্বাক্ষরকারী জনসংহতির অর্জনও কম নয়। চুক্তির কয়টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে, কয়টি হয়নি, এর চেয়েও জরুরী হলো, এর মাধ্যমে তাদেও জাতিগত অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। একদা যাদের দেশদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো , রাষ্ট্র তাদের শাসন কাঠামোয় শরিক করেছে। এটাই বড় স্বীকৃতি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীও সাংবিধাকি স্বীকৃতির দাবী জানাচ্ছে। আশা করছি অদূও ভবিষ্যতে তারাও সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাবে।

অনেকে বলছেন এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামে পুরোপুরি শান্তি আসেনি, এখনো অনেক বিষয় অমীমাংসিত রয়ে গেছে। যেমন ভূমির মালিকানা নির্ধারণ, অভ্যন্তরিন ও ভারত থেকে ফেরত আসা শরণার্থীদের পূণর্বাসন, বাঙালী অনুপ্রবেস বন্ধ না হওয়া, আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদের নির্বাচিন অনুষ্ঠিত না হওয়া ইত্যাদি। পাহাড়ী জনগোষ্ঠী বিশেষ কওে জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে এসব দাবী বারবার তোলা হচ্ছে, তারা সরকারের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গেও বৈঠকে বসছে। এর পরেও আশার কথা যে ধীরে ধীরে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর প্রতি বাঙালী শাসনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে শুরু করেছে। ১৯৯৭ সালে চুক্তি স্বক্ষরের পর দীর্ঘ ১২ বছরে যেসব সরকার ক্ষমতায় ছিল তারা চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যতটা নিষ্ক্রিয় ছিল বর্তমান সরকার তা নয়। বর্তমান ক্ষমতাশীল আওয়ামীলীগ সরকার নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী পার্বত্য শান্তি চুক্তির অবাস্তবায়ীত বিষয় গুলো বাস্তবায়নের জন্য কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন কিছু কিছু সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করে নিয়েছে, ভূমি কমিশন গঠন করেছে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো, চুক্তিটি সাক্ষরিত হয়েছে তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে। তখন বিরোধী দল ছিল বিএনপি-জামায়তসহ তাদের শরিক দল সমূহ ও অন্যান্য দল। আওয়ামীলীগ সরকারকে সেই সময়ে প্রবল বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ফলে তাদেও পক্ষে চুক্তি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।২০০১ সালে ক্ষতায় আসে জামায়ত-বিএনপি জোট সরকার। তারা বিরোধী দলে থাকার সময়ে যেসব কায়ণে চুক্তির বিরোধীতা করেছিল ক্ষমতায় এসে কিন্তু তারাও চুক্তি বাতিল করেনি বরং কিছুটা ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে। ১৯৯৭-২০০১ সালে আওয়ামীলীগ সরকারকে চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেসব বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবার তা নেই বললেই চলে। এখন আর কেউ দাবী করেনো চুক্তি বাস্তবায়িত হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারত হয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

এই পদক্ষেপ সরকারের প্রতি পাহাড়ীদের আস্থা ও বিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে। সম্প্রতি সেখান থেকে অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহারের কাজ সরকার শুরু করেছে। তবে বিরোধি দল সহ অনেকেই এর বিরোধীতা করছে। যেখানে রাষ্ট্রের চোখে সব অঞ্চলের নাগরিক সমান, সেখানে একটি বিশেষ অঞ্চলে অঘোষিত সেনা শাসন থাকবে কেনো? গৃহযুদ্ধ ও সশস্ত্র লড়াইয়ের অজুহাতেই পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প বসানো হয়েছিল, পাঠানো হয়েছিল বাড়তি সেনা। অনেকে যুক্তি দেখাচ্ছেন, সেনা ক্যাম্প তুলে নেওয়া হলে সীমান্ত অরক্ষিত থাকবে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ কারনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরকার তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সেনা বাহিনী মোতায়েন করে থাকে। যেমন– প্রাকৃতিক দূর্যোগ, দাঙ্গা ইত্যাদি কারণে। পার্বত্য চট্টগ্রামেও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত বিডিআর আছে, তিন তিনটি সেনাক্যাম্প আছে। সীমান্ত রক্ষার জন্য তারাই যথেষ্ঠ। প্রয়োজনে সরকার সমস্যার সমাধানের জন্য সেনাবাহিনী পাঠাবে। সমাধান হয়ে গেলে তাদের আবার ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

পার্বত্য চুক্তি সাক্ষরের পর পাহাড়ীদের একটা অংশ এর বিরোধতিা বরেছিল। পরবর্তী সময়ে তারা ইউপিডিএফ নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠনও গড়ে তোলে। তাদের আশঙ্কা ছিল, সরকার চুক্তি করলেও বাস্তবায়ন করবেনা।চুক্তি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করেই সরকারকে প্রমাণ করতে হবে তাদের আশঙ্কা অমূলক ছিল। সমগ্র পাহাড়ী জনগণের অস্তিত্বের প্রশ্ন যেখানে জড়িত সেখানে তাদের মধ্রে কোনো বিরোধ বা বিভক্তি কাম্য নয়।

সরকার গঠিত হয় সমগ্র দেশের নাগরিকদের ভোটের মাধ্যমে। ৬৪ টি জেলার মধ্যে মাত্র ৩টি জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল গঠিত। ৬১ টি জেলার জনগণের কথা সরকারকে অবশ্যই বেশি প্রধান্য দিতে হবে। কারণ বাংলাদেশ হলো গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে পাহাড়ী বা বাঙালী সকলের যেমন সমান অধিকার আছে তেমনি সংখ্যাগোরিষ্ঠেরও মতামতের বিষয়টিও সরকারকে ভাবতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির একযুগ পূর্তিতে চুক্তির সফলতা ও বিফলতা সম্পর্কে প্রথম আলোতে দেওয়া জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার সাক্ষাকারের কিছু অংশ নিচে তুলে ধরা হলোঃ– চুক্তির বাস্তবায়ন সম্পর্কে তিনি বলেন," পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি আজও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের যে লক্ষ্য নিয়ে স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেই লক্ষ্য আজও অর্জিত হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় গত ১২ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা সংরক্ষিত হতে পারছে না। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়া চরম অনিশ্চয়তা ও অচলাবস্থার মধ্যে রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর তৎকালীন সরকার চুক্তির কিছু বিষয় বাস্তবায়ন করেছে। এসব বিষয়ের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন প্রণয়ন, পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থাপন, ভারত থেকে পাহাড়ি শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন, অস্ত্র জমাদান, ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ প্রণয়ন, অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার ইত্যাদি বিষয় অন্যতম। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়নে তৎকালীন সরকার এগিয়ে আসেনি।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার মূল কারণ সম্পর্কে তার অভিমত:

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার অন্যতম দিক হচ্ছে ভূমিসমস্যা। পার্বত্য চট্টগ্রামে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ এমনিতেই অত্যন্ত কম। অধিকন্তু ১৯৬০ সালে কাপ্তাই নির্মিত হওয়ার ফলে ৫৪ হাজার একর চাষযোগ্য জমি বাঁধের পানিতে তলিয়ে যায়। অধিকন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে বিপুল পরিমাণ আবাদযোগ্য জমি রয়েছে– এই প্রতারণামূলক অজুহাত দেখিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৭৯ সাল থেকে দেশের সমতল জেলাগুলো থেকে চার লক্ষাধিক বহিরাগত বাঙালিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসে এবং এসব সেটেলার বাঙালি প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদদে জুম্মদের জায়গাজমি দখল করে নেয়। এভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিসমস্যা জটিলতর হয়ে ওঠে। ভূমিসমস্যাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুসারে সমাধানের লক্ষ্যে চুক্তিতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি ভূমি কমিশন গঠন করার বিধান হয়েছে। সে অনুযায়ী ভূমি কমিশন গঠিতও হয়েছে। কিন্তু ২০০১ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন চুক্তি অনুযায়ী প্রণীত না হওয়ায় ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তির কাজ শুরু হয়নি। ভূমি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারাগুলো সংশোধনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ থেকে ১৯ দফাসংবলিত সুপারিশমালা সরকারের কাছে পেশ করা হয়। আজ অবধি ওই বিরোধাত্মক ধারাগুলো সংশোধন করা হয়নি। অচিরেই আইন সংশোধন করা বাঞ্ছনীয়। অধিকন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের বিধিমালা এখনো প্রণীত হয়নি। প্রয়োজনীয় জনবল ও পরিসম্পদসংবলিত কমিশনের স্বতন্ত্র কার্যালয় স্থাপিত হয়নি। এগুলো করা জরুরি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অনেক আগেই তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক, নির্বাচন না করেই দলীয় নেতা-কর্মীদের পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্যপদে মনোনয়ন দিয়ে বছরের পর বছর ধরে অন্তর্বর্তী পার্বত্য জেলা পরিষদ অগণতান্ত্রিকভাবে পরিচালনা করছে। বস্তুত অন্তর্বর্তীকালীন এসব পরিষদের জনগণের কাছে কোনো দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহি নেই। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচনের জন্য পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান-সদস্যদের নির্বাচন বিধিমালা ও ভোটার তালিকা বিধিমালা প্রণয়ন করা এবং স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা অত্যন্ত জরুরি।

Dhaka University Institutional Repository

আশি ও নব্বইয়ের দশকে প্রায় দুই হাজার প্লট (প্রতিটি ২৫ একর করে প্রায় ৫০ হাজার একর জমি) রাবার বা উদ্যান চাষের জন্য অস্থানীয় ব্যক্তিদের ইজারার ভিত্তিতে বরাদ্দ দেওয়া হয়। ইজারা পাওয়ার পর ১০ বছরের মধ্যে (পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের আগে) যেসব প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি বা জমির সঠিক ব্যবহার করা হয়নি, সেসব জমির ইজারা বাতিল করার বিধান রয়েছে চুক্তিতে। এ লক্ষ্যে চুক্তির পর সরকার ১৯৯৯ সালে জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা দেয়। কিন্তু জেলা প্রশাসকেরা নির্দেশ অনুসারে বরাদ্দ করা এসব প্লট বাতিল করেননি। পক্ষান্তরে নিয়ম লঙ্ঘন করে নতুনভাবে ইজারাও দেওয়া হচ্ছে। ইজারা দেওয়া এসব ভূমি ছিল মূলত আদিবাসীদের জুম ভূমি ও যৌথ মৌজা বন। এই ইজারা দেওয়ার ফলে শত শত আদিবাসী পরিবার প্রথাগত জুম চাষ ও গৃহস্থালির জন্য বনজ সম্পদ আহরণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সার্বিকভাবে তাদের জীবনযাত্রা বিপন্ন হয়ে পড়ছে। ভূমি ইজারাদারেরা আদিবাসী জুমচাষিদের জুম চাষে বাধা দিচ্ছে এবং তাদের ওপর সন্ত্রাসী দিয়ে হামলা করাচ্ছে।

সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার সম্পর্কে তিনি বলেন:

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রায় সাড়ে পাঁচ শ অস্থায়ী ক্যাম্পের মধ্যে ৩১টি ক্যাম্প প্রত্যাহারের চিঠি জনসংহতি সমিতির হস্তগত হয়েছে। এরপর ক্যাম্প প্রত্যাহারের বিষয়ে কোনো চিঠি আমাদের হস্তগত হয়নি। কিন্তু সরকার দাবি করছে, এযাবত্ দুই শতাধিক ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন কোন ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে, তার তালিকাসংবলিত কোনো চিঠিপত্র জনসংহতি সমিতির হস্তগত হয়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ২৯ জুলাই একটি ব্রিগেডসহ ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু জনসংহতি সমিতির কাছে প্রত্যাহারসংক্রান্ত কোনো দলিল পাঠানো হয়নি। সরকার কেন অস্বচ্ছ পদ্ধতি অনুসরণ করছে, তা বোধগম্য নয়। প্রত্যাহৃত ৩৫টি সেনাক্যাম্পের মধ্যে কয়েকটি ক্যাম্পে নতুন করে আনসার ও এপিবিএনের সদস্য মোতায়েন করে ক্যাম্প বলবত্ রাখা হয়েছে। অধিকন্তু ২০০১ সালে অপারেশন উত্তরণ জারি করা হয়, যা এখনো বলবৎ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাধারণ প্রশাসনে এবং আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে স্থানীয় সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ ও কর্তৃত্ব অব্যাহত রয়েছে।

অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের ফলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির প্রশ্ন অবান্তর। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য পুলিশ বাহিনী রয়েছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো তারাই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনায়াসে মোকাবিলা করতে পারে। এ ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও আইন অনুসারে 'পুলিশ (স্থানীয়)' এবং জেলা পুলিশ নিয়োগের বিষয়টি পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা জরুরি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল বাধা কোথায় এ বিষয়ে তিনি মনে করেনঃ

সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে সরকারের বা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। দ্বিতীয়ত, শাসকগোষ্ঠীর জাত্যভিমান এবং সাম্প্রদায়িক ও অগণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি চুক্তি বাস্তবায়নে অন্যতম বাধা হিসেবে কাজ করছে। তৃতীয় বাধা হচ্ছে 'অপারেশন দাবানল'-এর পরিবর্তে জারি করা অপারেশন উত্তরণ। এর বদৌলতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা কর্তৃত্ব বলবত্ রয়েছে, যা চুক্তি বাস্তবায়নে বাধা। চতুর্থত হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক বাধা। দেশের অনেক আমলাই আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার ও সংস্কৃতি, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সংবেদনশীল নন। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাঁদের কার্যকর সহযোগিতা ও সক্রিয় উদ্যোগ দেখা যায় না। পঞ্চমত, মৌলবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক তৎপরতা। একদিকে তথাকথিত সম-অধিকার আন্দোলনের মাধ্যমে উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী তৎপরতা চালিয়ে চুক্তি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে, অন্যদিক সাম্প্রদায়িকতার সুযোগে পার্বত্য চট্টগ্রামে জঙ্গি মৌলবাদী ঘাঁটি গড়ে উঠছে। এসব তৎপরতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চুক্তি বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে।

এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর চুক্তি বাস্তবায়নের কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে খাগড়াছড়ি থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরাকে প্রত্যাগত পাহাড়ি শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনসংক্রান্ত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগদান, সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি পুনর্গঠন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান

Dhaka University Institutional Repository

পদে বান্দরবানের এমপি বীর বাহাদুর উশৈসিংকে নিয়োগ, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগের মাধ্যমে ভূমি কমিশন পুনর্গঠন করা এবং একটি ব্রিগেডসহ ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের ঘোষণা করা। এগুলো ইতিবাচক পদক্ষেপ। তবে গত ১১ মাসে চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়নে জোরালো ও কার্যকর উদ্যোগ দেখা যায়নি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জুম্ম জনগণসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে নানা শঙ্কা ও উদ্বেগ দেখা দিচ্ছে। আমি আশা করি, সরকার অনতিবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ নেবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির এক যুগ পূর্তি উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদার চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ার পেছনে যুক্তি তুলে ধরে বলেনঃ " দীর্ঘ সময় ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল একটি অশান্ত জনপদের নাম। সংঘর্ষ, সংঘাত, রক্তপাত, অস্ত্রের ঝনঝনানি আর বারুদের গন্ধ বিরিয়ে রেখেছিল এই জনপদকে। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।যাঁরা এত দিন অস্ত্র দিয়ে দাবিদাওয়া আদায় করতে চেয়েছেন, তাঁরাও অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। অস্ত্র দিয়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, এটা আবার প্রমাণিত হয়। গত ১২ বছরে চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন না হওয়ার বড় কারণ হলো, চুক্তির পর আমরা পর্যাপ্ত সময় পাইনি। বিএনপির পাঁচ বছরে কোনো অগ্রগতিই ঘটেনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব ছিল না, তবু তারা বারবার ঘোষণা করেছে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন করবে। কিন্তু কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ২০০১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত যাঁরা এ চুক্তি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন, বাস্তবায়ন নিয়ে হতাশ ছিলেন, তাঁদের সে হতাশার কারণগুলো এখন দূরীভূত হয়েছে বলে আমরা মনে করি। নির্বাচনী অঙ্গীকার মোতাবেক শেখ হাসিনা দায়িত্ব গ্রহণ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্দেশনা দিয়েছেন। আমরা তাঁর নির্দেশমতো কাজ করে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি, শরণার্থী পুনর্বাসন টাস্কফোর্স, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পুনর্গঠন এবং ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ভূমি কমিশনও করেছি। কমিটি বা সংস্থাগুলো ন্যস্ত দায়িত্ব আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করছে। কাজেই আমরা শিগগিরই শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখতে পাব।

Dhaka University Institutional Repository

দীপঙ্কর তালুকদার

২০০১ সালের পর থেকে চুক্তির সপক্ষের এক শক্তির বিরুদ্ধে অন্য শক্তি কথা বলতে গিয়ে চুক্তির সপক্ষকে আমরা দুর্বল করে ফেলছি। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, চুক্তির সপক্ষশক্তি যেন কোনো অবস্থায়ই দুর্বল হয়ে না পড়ে।ভূমি সমস্যা পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল সমস্যা। ভূমি সমস্যার যদি সমাধান দিতে না পারি, তাহলে শান্তিচুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন কখনো সম্ভব নয়। শান্তিচুক্তি অর্থহীন হয়ে পড়ে, যদি ভূমিবিরোধের নিষ্পত্তি না হয়। এখন ভূমি কমিশনের কাজ সবে শুরু হয়েছে। সচিব নিয়োগের যে কথা ছিল তাও সবে হয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যে কার্যক্রম শুরু হবে। ভূমি কমিশন নিয়ে কিছু মতভেদ দেখা যাচ্ছে, কিছু মন্তব্য আসছে। আমার মনে হয়, এগুলো বড় কিছু হবে না। আলাপ-আলোচনায় বসলে, কথা হলে, এগুলো সমাধান হয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য এলাকা থেকে সেনাছাউনি প্রত্যাহার করা হলে বাঙালিদের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিঘ্নিত হবে বলে আশঙ্কা অনেকের।এ প্রসঙ্গে দীপংকর তালুকদার বলেন: সেনা প্রত্যাহারের যাঁরা বিরোধিতা করছেন, তাঁদের প্রতি সম্মান রেখে আমি বলব, তাঁরা মনে হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাটা মোটেও বোঝেন না। তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে জনগণকে বিপথগামী করার চেষ্টা করছেন। পার্বত্য চুক্তিতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম একটা বিশেষ স্পর্শকাতর এলাকা বলেই ছয়টা স্থায়ী সেনানিবাস থাকবে। বাংলাদেশের অন্য কোথাও একই পরিমাণ ভৌগোলিক এলাকার ভেতর ছয়টা সেনানিবাস নেই। সুতরাং সেনাবাহিনী প্রত্যাহার হয়ে যাচ্ছে, এ কথাটা ঠিক নয়। চুক্তির কারণেও সেনা প্রত্যাহার হয়েছে। আবার রুটিন-ওয়ার্ক হিসেবেও অপ্রয়োজনীয় অস্থায়ী সেনাছাউনি তুলে নেওয়া হয়েছে। এটা বিএনপির আমলে হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও হয়েছে। তখন তারা জানতে পারেনি। আমাদের সময়ে তথ্য অধিকার আইন পাস হওয়ায় আমাদের জানাতে হচ্ছে বলে জানিয়েছি। তবে আইএসপিআর পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছে বিএনপির আমলে কয়টা প্রত্যাহার হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে কয়টা হয়েছে। এর পরও যাঁরা এটা নিয়ে কথা বলতে চান, আমরা বলব, তাঁদের উদ্দেশ্য মহৎ নয়। শুধু তা-ই নয়, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা যাবে না, এটা নিয়ে উচ্চ আদালতে একটা মামলা করা হয়েছিল। কিন্তু মাননীয় আদালত তা খারিজ করে দিয়েছেন। আর অস্থায়ী সেনাছাউনি তুলে নেওয়ার কারণে এত দিন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে বলে মনে হয় না।

বিএনপি-জামায়াত এ চুক্তিকে বলেছিল সংবিধান ও সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী কালো চুক্তি, যদি তারা সরকার গঠন করতে পারে, তাহলে সেটাকে বাতিল করবে। এ ধরনের ঘোষণা দেওয়ার পরও ক্ষমতার পাঁচ বছরে তারা এ চুক্তি বাতিল করেনি। অন্যদিকে আমরা লক্ষ করেছি, চুক্তি বহাল রেখে এখানে সাম্প্রদায়িক উসকানি দিয়ে পাহাড়ি-বাঙালির ভেতর একটা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাধিয়ে দিয়ে ফায়দা লোটার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তারা সফল হয়নি। এর বড় প্রমাণ ২০০৮ সাল। এখানে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর নামে যারা ভোট চেয়েছে, আঞ্চলিকতার নামে যারা ভোট চেয়েছে, তারা ভীষণভাবে পরাজিত হয়েছে। সুতরাং পার্বত্য এলাকার জনগণ এটা প্রমাণ করেছে, তারা সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করে না, আঞ্চলিকতা ও সংকীর্ণতায় বিশ্বাস করে না। তারা জাতীয় রাজনীতির মূল স্রোতের সঙ্গে থাকতে চায়। এখানে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চর্চা হোক এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকশিত হোক—এটা এখানকার জনগণ চায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা:

১। ফ.র আল সিদ্দিক, বাঙালীর জয় বাঙালীর ব্যর্থতা, পৃষ্ঠা: ৯৭-৯৮

২। দৈনিক প্রথম আলো, ২ ডিসেম্বর ২০০৯

৩। ইলোরা দেওয়ান (মানবাধিকার কর্মী), সাধারণ সম্পাদক: হিল উইমেন্স ফেডারেশন, দৈনিক প্রথম আলো, ২৯ জুলাই ২০০৯

৪। দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ এপ্রিল ২০১০

৫। ৫দৈনিক প্রথম আলো, ৫ অগাস্ট ২০০৯

৬। দৈনিক প্রথম আলো, ২ ডিসেম্বর ২০০৯

৭। ইউ.এন.ডি.পি –র পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিনিধি, রাজপূণ্যা উৎসব, ১৪ জানুয়ারি ২০১০

৮। মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা স্মারকগ্রন্থ

৯। দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ জুলাই ২০০৯

১০। মেসবা কামাল, নিজ বাসভূমে পরবাসী ২০০৬, পৃষ্ঠা: ৩৬

১১। আসিফ নজরুল, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, দৈনিক প্রথম আলো, ২ ডিসেম্বর ০৯

১২। দৈনিক প্রথম আলো, ২ ডিসেম্বর ০৯

১৩। চিন্ময় মুৎসুদ্দী, প্রাগুক্ত, পৃ:৩৪

১৪। ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, পার্বত্য শান্তিচুক্তি একটি আগাগোড়া প্রামান্য বিশ্লেষণ, বাংলাদেশ সেন্টার ফর সোশিও পলিটিক্যাল রিসার্চ, ঢাকা, ১লা জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ:২২

১৫। দৈনিক প্রথম আলো, ২ ডিসেম্বর ০৯

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম:

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের সাথে বাঙালী জনগোষ্ঠীর সংহতি প্রতিষ্ঠার সংকট:একটি বিশ্লেষণ

নাম:

পেশা:

তারিখ:

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে যেসব বাঙালী রয়েছে তাদের সাথে আপনাদের সম্পর্ক কেমন?

২। বিভিন্ন সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সমভূমি থেকে বাঙালীদের স্থানান্তর করা হয়েছে–বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

৩। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আপনার যেমন অধিকার আছে বাংলাদেশের যেকোনো জায়গায় বসবাস করার তেমনি একজন বাঙালীরও তো অধিকার আছে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করার–এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

৪।বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকার ১৯৯৭ সালে যখন ক্ষমতায় ছিল তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে পার্বত্য শান্তিচুক্তি করেছে। অনেকেই আছেন এর বিরোধী। এই বিরোধীতার কী কারণ আছে বলে আপনি মনে করেন?

৫। একটা দেশে অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির মানুষ বাস করতেই পারে। নিজ নিজ ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান পালনের নিশ্চয়তা যদি রাষ্ট্র দিতে পারে তাহলে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বলে কি আপনি মনে করেন?

৬। আপনি জাতিতে একজন চাকমা বা মারমা। কিন্তু নাগরিক হিসেবেতো আপনি একজন বাংলাদেশীও। বাংলাদেশের জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একজন নাগরিক হিসেবে আপনার কী কী দায়িত্ব-কর্তব্য আছে বলে আপনি মনে করেন?

৭। বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার মধ্যে ৩ টি জেলা নিয়ে এই পার্বত্য অঞ্চল গঠিত। এখানে যদি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক স্থিতিশীলতা না আসে তাহলে তা দেশের সার্বিক উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে–এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

৮। আপনাদের মধ্যে অনেকেই অন্য দেশে বা অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে। তাদের চলে যাওয়ার কারণটা কী ছিল? শান্তিচুক্তির পর অনেকেই ফিরে এসেছে, এখনও অনেকে আসছেন। তাদের ফিরে আসাটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন? তাদের ফিরে আসাতে কি কোনো সমস্যা হচ্ছে? তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারের পদক্ষেপকে কি আপনি পর্যাপ্ত মনে করছেন?

Dhaka University Institutional Repository

৯। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য যেসব পদক্ষেপ নিয়েছেন সেগুলো কতটুকু যুক্তিযুক্ত বলে আপনি মনে করেন?

১০। পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্থিতিশীলতা বিরাজ করার বা অশান্তির মূল কারণ ভূমি সমস্যা। সরকার এই সমস্যা সমাধানের জন্য তো ভূমি কমিশন গঠন করেছে। ১৯০০ সালের বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন অনুযায়ী ভূমি সমস্যার সমাধানের পক্ষে আপনারা। বাংলাদেশ তো এখন পুরোপুরি স্বাধীন একটা দেশ। দিন দিন তো অনেক নূতন নূতন আইন প্রণীত হচ্ছে ভূমি সংক্রান্ত যা সমভূমির বাঙালী বা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীরাও মেনে নিচ্ছে। আপনারা কেন এর বিরোধীতা করছেন?

১১। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীরা যদি তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে সরকারের সাথে আলোচনায় বসে এবং আলোচনার মাধ্যমে যদি সরকারকে সমস্যাগুলো অবহিত করে তাহলে অবস্থার কি কোনো উন্নতি হবে বলে আপনি মনে করেন?

১২। আন্দোলন সংগ্রামের কারণে দেশের অভ্যন্তরেরই একটা অংশে যদি সবসময় অস্থিতিশীলতা বিরাজ করতে থাকে তাহলে সেটাতো দেশের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকীস্বরূপ। এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

১৩। আদিবাসীদের একটা অভিযোগ, এখানকার সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাদের মনোভাব আদিবাসীদ্বেষী। এর সঙ্গে আপনি কি একমত?

১৪। যেহেতু হেডম্যান, চেয়ারম্যান, কার্বারী উপজাতী থেকে নির্বাচিত/মনোনীত, সেহেতু অ-উপজাতীয় যারা আছেন তারা বৈষম্যের স্বীকার হচ্ছে বলে অনেকে মনে করেন। এক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন?

১৫। অ-উপজাতীয় ও স্থায়ী বাসিন্দার সার্টিফিকেট না পেলে সংরক্ষিত আসনে বাঙালীরা নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেনা এবং ভোটও দিতে পারবেনা। যাকে অনেকে মৌলিক অধিকার লংঘন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করে থাকেন। কথাটা কি বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? কিংবা এক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন?

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার ও নিজস্ব অভিমত

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার ও নিজস্ব অভিমত:

জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে কীভাবে জাতি গঠনের কাজটিকে এগিয়ে নেওয়া যায় আর সেই অর্থে কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তর নেই, নেই কোনো আদর্শগত সমাধান। জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন কর্তৃত্বের ব্যাপক ব্যাপ্তি আর দায়িত্বশীলতা এবং সকল স্তরের জনগণের অংশগ্রহণ। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের বৃহত্তম একটি এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামে যে বিদ্রোহী সমস্যা এদেশের সবগুলো সরকারকে ব্যতিব্যাস্ত রেখেছে তার সুষ্ঠ ও ন্যায়সঙ্গত সমাধান ছাড়া জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা কারো মতে রাজনৈতিক, কারো মতে অর্থনৈতিক আবার কেউ মনে করেন দুটোই। প্রধান কারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হলেও এই সমস্যাটি প্রকৃতপক্ষে বহুমাত্রিক। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও এই সমস্যার রয়েছে প্রশাসনিক, সামরিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক, কূটনৈতিক ও মানবিক দিক এবং এই প্রতিটি দিকই একটি আর একটির সাথে জড়িত। এই সমস্যার সূত্রপাত হয়েছে রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ কতৃক, বিস্তৃতি লাভ করেছে সামরিক, বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং তাদের দ্বারা সুবিধাপ্রাপ্ত কিছু সংখ্যক পাহাড়ী ও বাঙালী জনগনের দ্বারা।

পার্বত্য চট্টগ্রামে অঞ্চলে গবেষণার কাজে ফিল্ড ওয়ার্ক তথা স্বাক্ষাৎকার পদ্ধতি গ্রহণ করে যে মৌলিক বিষয়টি বের হয়ে এসেছে তার সারমর্মও এরকম। অর্থাৎ সেখানে বসবাসরত পাহাড়ী ও বাঙালী উভয়েই চায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। সাধারণ পাহাড়ী জনগণের বক্তব্য হলো, "তারা এখানের বাঙালীদের সাথে মিলেমিশেই আছে। তবে কিছু কিছু রাজনৈতিক ব্যাক্তিবর্গের কারণে সেখানে অশান্ত অবস্থা বিরাজ করছে। তাদের ধারণা, চুক্তি দিয়ে আসলে কিছু হবেনা। যতদিন এখানকার মানুষ শিক্ষিত হবেনা, সচেতন হবেনা ততদিন এই সমস্যার কোনো কার্যকরী সমাধানও হবেনা। চাকমারা ছাড়া সেখানকার বেশিরভাগ জনগণই অশিক্ষিত। তাদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেলে, শহরাঞ্চলের সাথে যুক্ত হলে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং তারা এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসবে"। তারা আরো বলে "এখানে আমাদের স্বাধীনভাবে অনেক কিছুই করার অধিকার রয়েছে, আমরা আমাদেরই আচার-অনুষ্ঠান পালন করবো তবে এমন কিছু করা ঠিক হবেনা যা রাষ্ট্রীয় আনুগত্যকে আঘাত করে"।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালী জনগোষ্ঠীও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাহাড়ী ক্ষুদ্রজনগোষ্ঠীর সাথে মিলেমিশে আছে। তাদের বক্তব্য হলো, "বাঙালী হিসেবে এখানে আমাদের নিরাপত্তার কোনো সমস্যা নেই। তাদের দাবি বিশেষ একটি গ্রুপ এখানে সমস্যা করছে এবং তাদের সংখ্যা ৫% এর বেশি হবেনা। এই ৫% পাহাড়ী ক্ষুদ্রজনগণ চায় পার্বত্য অঞ্চলে কোনো বাঙালী থাকতে পারবেনা, তারা সেখানে স্বায়ত্বশাসন চায়। বেশির ভাগ পাহাড়ী জনগণই চায় সমভূমির নিয়মেই অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী সেখানে সবকিছু চলুক"।

১। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে সময়ক্ষেপন সমস্যাটিকে আরো জটিল করে তুলেছে। পাহাড়িদের সাথে বাঙালিদের ভূমিবিরোধের নিষ্পত্তি না হওয়ায় বিরাজ করছে অনাকাঙ্খিত দ্বন্দ্ব। চুক্তি বাস্তবায়নে একযুগেরও বেশি সময় কেটে যাওয়ায় তা বিভেদকারী শক্তিকেই উৎসাহিত করছে। ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ স্বাক্ষরিত হয় পার্বত্য শান্তিচুক্তি। ২০০১ এর নির্বাচনে চারদলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পর পাঁচ বছর মূলত শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন কাজ থেমে ছিল। বর্তমান সরকার শান্তিচুক্তির ব্যাপারে আন্ত রিক হলেও কাজের তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। চুক্তির যেসব জটিল সমস্যা রয়েছে সেগুলোর সমাধান করে চুক্তি বাস্তবায়ন করা অতি জরুরি।

২। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বলে তাদের স্বার্থ উপেক্ষিত না করে বরং তা সংরক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের বাংলাদেশেরই একজন নাগরিক হিসেবে ভাবতে হবে। তাদের নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ইত্যাদি যেন উপেক্ষিত না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

৩। দীর্ঘদিনের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি পাহাড়ের যে অবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে তা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্যই পাহাড়ি ও বাঙালীদের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক গড়ে তোলার দিকে নজর দিতে হবে। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার পর্যটন সম্ভাবনাকে কাজে লাগালে তা ঐ এলাকার অধিবাসীদের ভাগ্যোন্নয়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিকেও সমৃদ্ধ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪। রাজনীতিতে, বিশেষ করে সরকার গঠনে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর অংশগ্রহণের সংকট দেখা দিলে তা জাতীয় সংহতির জন্য হুমকী হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ও শাসন পরিচালনায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের সংকট রয়েছে। স্থানীয় ও গোষ্ঠীগত রাজনৈতিক কার্যক্রমের বাইরে এসে তাদের জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং আমাদেরও সেই সুযোগ তাদের দিতে হবে।

৫। যেকোনো জাতির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ হচ্ছে সে দেশে বাস করার প্রধান শর্ত। জাতি গঠনের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করে। প্রাদেশীক বা আঞ্চলিক সায়ত্তশাসনের মনোভাব ত্যাগ করে আদিবাসীদের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে। যদিও এই সংখ্যাটি খুব কম তথাপি এই মনোভাবের কারণে সেখানে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করে।

৬। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসাধারণকে আরো বেশি সচেতন, আরো বেশি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সরকারকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। তাদেরও সেই মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে যে, তারা এদেশেরই জনগণ। বাঙালী, আদিবাসী নির্বিশেষে সকলের জাতীয় ঐক্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হতে হবে।

৭। আদিবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি "সাংবিধানিক স্বীকৃতি"। স্বাধীনতার পর তারা তাদের বিষয় সংবিধানে সংযুক্ত করার দাবি জানিয়েছে, আজো জানিয়ে আসছে। কাজেই তাদের সাথে আলোচনায় বসে তাদের যুক্তিসংগত দাবিদাওয়াগুলোর সাংবিধানিক স্বকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকারকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। আমরা বাংলাদেশরে নাগরিক কাজেই আমরা বাঙালী, আমাদের এই মানসিকতা থেকে বেড়িয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশী নাগরিক হবার সাথে বাঙালী জাতিতে পরিণত হবার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। বাংলাদেশী নাগরিক মানেই যদি বাঙালী হয়ে যাওয়া হতো তাহলে পৃথিবীর বাংলা ভাষাভাষী সকল মানুষও বাংলাদেশী নাগরিক হতো।